পুণ্য ব্রহ্মর্ষি গ্রন্থাবলী।

হেমজ্যোতি।

(সচিত্র)

৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৮২৬ শক, ১৩১১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতাঃ
"পুণ্য যন্ত্রে"
এবাদত আলি খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং
৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
আখ্যাপত্র	/০
সূচীপত্র	৶০
ভূমিকা	৷/০
ঈশ্বরেরপ্রেম ও দূরদর্শিতা	১
মনুষ্যশরীরের কৌশল	৭
তৈল ব্যবহার	১০
সংস্কৃত ও প্রাকৃত	১৬
বঙ্গপ্রাকৃত	২৪
আত্মপ্রসাদ	২৮
মৃত্যু	২৮
অমরত্ব	৩২
ঋতুবর্ণনা	
(ক) বসন্ত	৩৫
(খ) গ্রীষ্মকাল	৩৬
(গ) নববর্ষা	৩৯
(ঘ) ভরাবর্ষা	৫২
দীক্ষাগুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	৪৫
কন্যার প্রতি পিতার স্নেহবচন	৪৭

বন্ধুর প্রতি উক্তি ৫০
জ্যায়ানের প্রতি কনীয়ান ভ্রাতার উক্তি ... ৫১
আলোক ও দৃষ্টি (সচিত্র) ৫৩
কৃতজ্ঞতা ৭১
পাপী ও পুণ্যাত্মা ৭৪
নিশীথে ৮২
ভক্তের শেষ কথা ৮৫
ঋগ্বেদ ৯২
সামবেদ ১০৬
যজুর্ব্বেদ ১১৩
আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম ১১৮

ভূমিকা।

সংসারে সচরাচর দুই প্রকার কর্ম্মশীল লোক দেখা যায়ঃ এক যাঁহারা কোন কিছু করিয়া নিজের নাম ধ্বনিত করিতে চাহেন, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া নিজ নাম ও কীর্ত্তি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ব্যস্ত নহেন। এই শেষোক্ত ভাবই নিষ্কাম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতেই ধর্ম্মের পূর্ণ মহত্ত্ব বিরাজ করে।

এই শেষোক্ত মহত্ত্বে স্বর্গীয় পিতৃদেবের উন্নত মন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজনাম প্রচারের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে চাহিতেন না। তাই তাঁহার অনেক কার্য্যকলাপ ভূমিনিহিত হেম-আকরের ন্যায় গূঢ় ভাবেই অবস্থান করিতেছে।

হেমকান্তি স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথের বাসবোপম শ্রী, তাঁহার বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহুযুগল ও মধুর গাম্ভীর্য্য যে একবার দেখিয়াছে সেই শ্রদ্ধাপূরিত হৃদয়ে মুগ্ধ না হইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার আত্মপ্রকাশে এতই অনিচ্ছা যে তাঁহার একখানি ফোটো পর্য্যন্ত তুলিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলিতেন "কি এমন কাজ করিয়াছি যে আমার আবার ছবির দরকার।" * সর্ব্বোপরি তাঁহার উদার চিত্ত ও মহান

---

* আমরা গ্রন্থের সঙ্গে এই যে ফোটোব্লকখানি দিয়াছি ইহা আমাদিগের কোন আত্মীয় প্রদত্ত একটী অতি পুরাতন ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের জীর্ণ ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। সে সময়ে ফোটোর এবং ফোটো তোলার

আত্মার কথা বলিতে গেলে লোকপালদিগের উচ্চ আসনে তাঁহাকে বসাইতে হয়।

পিতৃদেব স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথের মন সমুন্নত পিতৃভাবে গঠিত ছিল। পুরাকালে ভারতে বিজ্ঞানচক্ষু উন্নতমনা পিতৃগণ যেরূপ জনসমাজের পালনের দ্বারা সকলের অন্তরে পিতৃরূপে চিরজাগরুক, সেইরূপ এই নব্যযুগে বিজ্ঞানাত্মা মহানুভব হেমেন্দ্র নাথ সমুচ্চ পিতৃ-আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় পিতৃনামের গৌরব জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন।

সংসারে দুই পথ আছেঃ দেবযান ও পিতৃযান। যাঁহারা সংসারের শুভাশুভের প্রতি দৃকপাত না করিয়া মুক্তির প্রার্থী তাঁহারা দেবযান বা দেবপথ আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর যাঁহারা সংসারের কিসে মঙ্গল হয় এই উদ্দেশে সতত কর্ম্ম করেন তাঁহারা পিতৃযান-অবলম্বী।

"পিতৃণাং স্থানমাকাশং।"

শুভকারী পিতৃগণ আকাশের উচ্চে অবস্থান করিয়া আমাদিগের উপর সতত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

পিতার যে সকল সদ্‌গুণ ও মহত্ব থাকা আবশ্যক ৺ হেমেন্দ্র

ছড়াছড়ি ছিল না। কোন সখের (Amateur) ফোটোগ্রাফার বাটীতে আসিয়া এই ফোটোটী তুলিয়াছিলেন। ইহাও তিনি অনিচ্ছায় আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে তুলিতে সম্মত হয়েন। এই ফোটোটীতে কেবল তাঁহার মুখচ্ছবির আভাসমাত্র পাওয়া যায়। যাঁহারা তাঁহাকে সে সময়ে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন "এ ফোটোতে কি আছে? সে সুন্দর শ্রী সে পুরুষবিক্রম এই ফোটোতে সে রকম কিছুই প্রকাশ পায় নাই।"

নাথে তাহা চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় আকাশের অপেক্ষা উন্নত ছিল।

"খাৎ পিতা উচ্চতরস্তথা।"

তাঁহার জীবন পিতৃভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তিনি আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল অনন্তধামে গিয়াছেন; কিন্তু সেই যে পিতৃব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিফলে যায় নাই। এই বিংশ শতাব্দী দেবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।* লোকশিক্ষা, সংসারপালন এবং বিজ্ঞান দৃষ্টির তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিংশশতাব্দীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। নির্ভীকতা ৺ হেমেন্দ্র নাথের জীবনের এক প্রধান গুণ ছিল; জীবনের জন্য তিনি কোনরূপ ভয়কে ভয় বলিয়াই গণ্য করিতেন না। আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার মাতার জন্য যে তিনি নিজ বাহুমূল হইতে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের এক মহা হেমকীর্ত্তিরূপে (Golden deed) পরিগণিত হইবে। বিজ্ঞান ও রসায়ন তাহার প্রাণের বস্তু ছিল। তিনি বিজ্ঞান ও রসায়ন এবং অন্যান্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমাদিগের কার্য্য পূর্ণ করিতে পারেন।

---

* বিংশ শতাব্দী যে পিতৃপক্ষ বা দক্ষিণায়নে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে এ বিষয়ে আমি ১৩০৫ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার 'পুণ্য' 'তর্পণতত্ত্ব' প্রবন্ধে বিশদরূপে দেখাইয়া আসিয়াছি।

শ্রীঋ, না, ঠা।

আমাদিগের এই নবপ্রকাশিত "হেমজ্যোতি" গ্রন্থখানি কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক নহে; ইহা নানা বিষয়ক প্রবন্ধের একত্র সঙ্কলন। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ বাল্যকালের রচনা। তিনি নিজে ইহার "হেমজ্যোতি" নাম দেন নাই। এই নাম আমাদিগের প্রদত্ত। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার বিশেষত্ব এই যে, ধর্ম্মভাবের মধুর গাম্ভীর্য্যে প্রবন্ধগুলি যেন মাখা অথচ কিছুমাত্র নীরস নহে—সরল, হৃদয়গ্রাহী ও সরস। তাঁহার সময়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মতি গতি নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হইত। কিন্তু তিনি বরাবর বিজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের "আলোক ও দৃষ্টি" পাঠ করিলে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। "ঋতুবর্ণনা"র অন্তর্গত প্রবন্ধ চতুষ্টয় যদিও তাঁহার বাল্য বয়সের রচনা তথাপি ইহাতে মৌলিকতা ও রচনা নৈপুণ্য বিশেষ প্রকটিত হইয়াছে। ইহার আরেকটী বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আদিরস বা শৃঙ্গাররসের ছিটাফোঁটা নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে ইহা ঋতুসংহার নহে কিন্তু প্রকৃত ঋতুবর্ণন—বড়ই সরস স্নিগ্ধ ও গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। এমন কি ইহার অন্তর্গত উপমাগুলিও ধর্ম্মভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। "তৈল ব্যবহার" প্রবন্ধে নূতনত্ব আছে। "সংস্কৃত ও প্রাকৃত" এবং "বঙ্গপ্রাকৃত" প্রবন্ধদ্বয় ভাষাতত্ত্বমূলক। এত পূর্ব্বে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে এরূপ আলোচনা হয় নাই। "বঙ্গপ্রাকৃতে" বঙ্গীয় ব্যাকরণের নিয়মপ্রণালীর অবতারণা করা হইয়াছে। *

---

* ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসের 'পুণ্য' এই "বঙ্গপ্রাকৃত" প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে ইহার সম্বন্ধে মাননীয় "ইণ্ডিয়ান্ মিরর্" সম্পাদক

সর্ব্বশেষে বৈদিক প্রবন্ধগুলির কথা বলি। এইগুলি যদিও খণ্ডাকারে লিখিত হইয়াছিল তথাপি একটী বৃহৎগ্রন্থের অঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

"আর্য্যধর্ম্মের পরিণাম।"

"হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত।"

প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে ন্যূনাধিক প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে অথচ লোকের অগোচরে বনফুলের ন্যায় আপনার সৌরভে আপনি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন পাঠকদিগের গোচরার্থে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"A touching tribute is paid to the memory of the late Babu Hemendra Nath Tagore by publishing from the notes left by him, explanations of some Prakrita words, which are in Bengali. By doing so the editress has * * * rendered her father's valuable Jottings accessible to the reading public."

"Indian Mirror"

14th November 1897.

ইহার সুগন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত না করিয়া যাইবে না।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
যোড়াসাঁকো কলিকাতা।
২৫এ অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল।
১৮২৬ শক।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমজ্যোতি।

ঈশ্বরপ্রেম ও দূরদর্শিতা। *

আমরা যৌবনের প্রারম্ভে পদনিঃক্ষেপ করিয়াছি, আমরা যেন এখন হইতে দূরদর্শী হই—যেন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। শিশু সন্তানেরা বর্ত্তমানের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষু কদাপি উন্মীলন করে না। তাহাদিগের বর্ত্তমান ইচ্ছার শান্তি হইলেই, সুখী হয়; ক্ষুধায় ক্ষুধিত হইলেই ক্রন্দন করে এবং ক্ষুধার শান্তি হইলেই আমোদিত হয়। এই প্রকারে শিশুকাল গত হইয়া যখন বালক কাল উপস্থিত হয়, তখন আবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উদয় হইতে থাকে, তাহারা আগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যা-লয়ের ক্রীড়াকালকে উপেক্ষা করে, তাহারা শিক্ষকের তুষ্টি সাধনের নিমিত্তে অথবা দণ্ডপ্রাপ্তির ভয়ে বিদ্যাভ্যাসে মনো-নিবেশ করে। এইরূপে শিশুকাল ও বাল্যকালে ক্রীড়া ও আমোদেই অধিকাংশ সময় গত হয়। সংসারের কুটিল পথ দেখিতে তাহারা তখন অক্ষম থাকে; তাহারা চিন্তারহিত

* ১৭৮২ শকে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লিখিত।

হইয়া অক্লেশে সময় যাপন করে। তাহারা না মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, না ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হয়। তাহারা যেখানে থাকুক পুনঃ পুনঃ মাতার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং সৎপথস্থিতা ঈশ্বরপরায়ণা সাধ্বী মাতারাও সেই ধূলায় ধূসর অস্ফুট মধুরবাক্য সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে শত শত চুম্বন করতঃ ঈশ্বরোপাসনায় তাহাদিগের সেই কোমল মনকে অল্পে অল্পে রত করেন। কারণ তিনি তাঁহার পুত্রের যথার্থ মঙ্গল প্রার্থনা করেন। শিশুকালে হৃদয়ে যাহা একবার দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয়, তাহা বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই প্রকারে আনন্দের সহিত বাল্যকাল পর্য্যন্ত গত হয়; আমাদেরও সেই প্রকারে বাল্যাবস্থা গত হইয়াছে। এতদিন প্রায় আমরা ভবিষ্যতের দিকে চক্ষুকে একবারও উন্মীলন করি নাই, কেবল বর্ত্তমান লইয়াই জাগ্রত ছিলাম, এখন আমাদিগের চক্ষু উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখন আমাদিগের যে কেবল বর্ত্তমান ক্ষুধার শান্ত হইলেই হয় এমত নহে, এখন আমরা যে কত প্রকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করি, তাহার ঠিক নাই। যাঁহারা পুত্রকন্যা লাভ-দ্বারা পরিবারের স্বামী বলিয়া গণ্য হয়েন, তাঁহারা পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষা বিবাহ প্রভৃতির নানা প্রকার জল্পনা করেন ও তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে অতি দুঃখেতেও ধন সঞ্চয় করেন; যাঁহাদিগের কেবল বিবাহবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারা পুনরায় পুত্রকন্যার মুখ দর্শনের নিমিত্ত লালায়িত থাকেন এবং যাঁহাদিগের বিবাহবিধি সম্পন্ন হয় নাই তাহাদিগের কল্পনাসকল আকাশমার্গে উড্ডীন হইতে থাকে, তাঁহারা কত প্রকার যে আকাশদুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কত প্রকার মৃগতৃষ্ণিকায় যে ভ্রমণ করেন ও কত

প্রকার যে স্বর্ণজালে বদ্ধ হন, তাহার আর সীমা করা যায় না। এই প্রকার সাংসারিক আশারূপ-যষ্টি অবলম্বন করিয়া, যৌবনাবস্থায় পদার্পিত ব্যক্তিরা যদিও নানাপ্রকার ক্ষণিক দুঃখ অতিক্রম করে, যদিও তাহারা এই প্রকার আত্মগত মনোরথদ্বারা মনকে উজ্জ্বল রাখে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবেক, যে এই সকল মনোরথদ্বারা কখনই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। যদি কখন কোন ব্যক্তি এক সাংসারিক বিষয়ের নিমিত্তে লালায়িত থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহার মন কখনই তৃপ্তি লাভ করে না; তৎপরে অনেক কষ্ট করিয়া যদিও সে তাহার সেই অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা এখন কেবল তাহাকে ক্ষণিক সুখ প্রদান করে এবং সে ব্যক্তি শীঘ্রই তৎপ্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে। তবে ইহা এখন আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং এ প্রকার প্রণালীতে নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন যে আমরা এই অনিত্য সংসারে চিরস্থায়ী সুখ অপ্রাপ্ত হইয়া, সেই আনন্দরূপ অমৃতস্বরূপেরই প্রতি অটল ভাবে মন স্থাপন করিব,—যিনি আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতে ক্ষণ কালের নিমিত্তও বিরত হইবেন না এবং যে আনন্দ, উপভোগ দ্বারা কখনই পুরাতন বোধ হয় না বরং উহা নিত্যই নব্য বেশ ধারণ করে।

সাংসারিক দূরদর্শী মাত্র হইলে, তত উপকার দর্শে না, যত আমাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক দূরদৃষ্টি দ্বারা হইবার সম্ভব। ঈশ্বরবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলাপনই আমাদিগের যথার্থ হিতসাধক। ঈশ্বরপরায়ণ যুবকেরা ঈশ্বরানুরাগে মত্ত হইয়া ও ঈশ্বরের প্রীতি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, তাঁহাকে রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু বলিয়া গণ্য

করেন এবং এই রস আস্বাদন করিয়া তাঁহারা সাংসারিক কুটিল পথ অনায়াসেই অতিক্রম করেন। যদি পৃথিবীর কোন যথার্থ বন্ধুর প্রীতিলাভের নিমিত্ত অথবা লোকভয়ে ভীত হইয়া কোন মন্দ ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই, তবে কেন আমরা, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, যাঁহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও গোপন রাখিবার উপায় নাই এবং যিনি পাপীদিগের পক্ষে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" বলিয়া গণ্য হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত সকল মন্দ ইচ্ছা ও মন্দ কার্য্য পরিত্যাগ না করি—তাঁহার সহবাস সুখ লাভের নিমিত্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জন কেন না দিই। যদি আমরা সেই সকল কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই, যাহা তাঁহার ইচ্ছানুযায়িক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসন্নমুখ আমাদিগের প্রতি কেমন স্নিগ্ধরূপে প্রেরিত হইবে, কেমন তাঁহার সহিত আমাদের সহবাস লাভ হইবে, যে সহবাসের মর্ম্ম কোন পাপী কখনও বুঝিতে পারে না, এবং তাহা হইলে তাঁহার সিংহাসনের নিকট অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আমরা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, এত নিকট যে আমাদের আত্মা পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবে। যাহারা সংসারেই বদ্ধ থাকে, তাহাদিগের সাংসারিক ভোগের যে লালসা, তাহা কিছু কাল পরেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু হে জগদীশ্বর! তোমার অনুরাগ তাদৃশ নহে; ইহা যত পুরাতন হইতে থাকে, আমরা যত বৃদ্ধাবস্থাতে পদার্পণ করিতে থাকি, ইহা ততই দ্বিগুণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। যে পাপগ্রন্থি সকল গত বৎসরে আমার হৃদয়কে তোমা হইতে বিযুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার অনেককে আমার আত্মা অতিক্রম করিয়া তোমার বিন্দুমাত্র শান্তি বারি পান করিতে উন্মুখ রাখিয়াছে এবং এই অমৃত বিন্দু দ্বারা তৃষ্ণার শান্তি

করিয়া পুনরায় রিপুদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে আমাদের মন এক এক বার সংগ্রামস্থলে আসুরিক প্রবৃত্তি সকল দমন করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পুরস্কারের জন্য এক এক বার তোমার নিকটে শান্তিসলিল যাচ্ঞা করে। যাহারা ভীরু স্বভাব বশতঃ রিপুদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে, যাহারা তোমার কার্য্য করিতে লোকভয়ে ভীত হয়, তাহারা তোমার সেই প্রসন্ন মূর্ত্তিকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" রূপে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোজ্জ্বল মনে ধাবমান হয়েন। তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত গমন করে। তাঁহারা বর্ত্তমান সুখেও সুখী হয়েন এবং ভবিষ্যৎ আশাতেও প্রফুল্ল থাকেন। পাপী যুবকদিগের এ প্রকার ভাবের সম্ভাবনা নাই— তাহারা না সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পারে, না ভবিষ্যৎ আশাযষ্টি অবলম্বন করিতে পারে। তাহারা অনন্তকালের পর্য্যালোচনা মাত্র করিলেই ভয়ে কম্পিত হয়। তাহারা মনে করে যে এই সকল বিষয় ভাবিতে গিয়া পাছে তাহাদিগের মন সংসার হইতে আকৃষ্ট হয়, পাছে অনন্তকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া, সাংসারিক অনেকানেক মলিন সুখ হইতে তাহাদিগকে ছিন্ন হইতে হয়। এই প্রকার তাহারা পশুর ন্যায় বর্ত্তমান সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করে না, সাংসারিক কোন বস্তুর প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, তাহা কখন অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা যৌবনের তরঙ্গ যাহাতে অতিক্রম করিতে পারি, তাহার জন্য কি করিতেছি? হে পরমাত্মন্!

তোমার অধীনে আমাদের চিরকাল বাস ও সহায়ে আমাদের নির্ভর। তুমি আমাদিগকে ধন জন যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলই প্রদান করিয়াছ। কিন্তু এ সকল প্রদান করিয়াই, ক্ষান্ত হও নাই, তুমি আমাদিগকে সুখী করিবে এই হেতু স্বয়ং আপনাকে দান করিয়াছ এবং আমাদিগকে অমৃত নামের অধিকারী করিয়াছ। তোমার এই সকল মঙ্গলভাব পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমাদের মন নিস্তব্ধ হইয়া যায় এবং আমাদের জিহ্বা বাক্‌শূন্য হয়। কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সুখী থাকিতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত আমি ইহলোকে জীবিত রহিয়াছি সেই অবধি যে সকল আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া লইতে পারি, ইহার পরে আর কিছুই নাই। বিচারকর্ত্তা যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন সে কি কখন কারাবাসে তদবস্থায় থাকিয়া কতক ভোগের সামগ্রী পাইলেই সুখী হইতে পারে? কখনই না! অতএব হে মঙ্গলময়! তুমি যেন আমাদিগের আশাযষ্টি হইয়া এই তমসাবৃত সংসার হইতে তোমার পথে অগ্রসর করাও যাহাতে আমরা সকলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া সংসারাণো যথাসুখ ভ্রমণ করিতে পারি।

মনুষ্যশরীরের কৌশল। *

"আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"

"আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়"

আমাদিগের শরীর ও মনে যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে, তাহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা প্রত্যহই দেখি যে, যখন কোন বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপ আমাদিগের চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন আমাদিগের মনও ঐ বস্তুর ব্যাস পরিধি ও গভীরতা এবং আকৃতি ও বর্ণ জানিতে সমর্থ হয়, আমরা দেখি যে যখন এক প্রকার স্পন্দিত বায়ু আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন মনেও শব্দজ্ঞান হয়; অতএব এই প্রকার আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু সকল সহস্র সহস্র প্রকারে যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা আমরা জ্ঞাত হই। ইহা কোন্ তুচ্ছ বিষয়! এমন কি আমরা অন্যের মনের ভাব পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে বলিতে পারি। আমরা দেখি যে, যখন মনের ইচ্ছা হয় যে এই শরীর এস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবে কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম সমাধা করিবে তৎক্ষণাৎ উহা আজ্ঞাবহ হইয়া তদনুযায়িক করিয়া থাকে, আমাদিগের হস্ত পদ ও অন্যান্য অঙ্গ সকলও নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যে কি

---

* ১লা বৈশাখ ১৭৮১ শকে লিখিত। এক্ষণে ১৮২৪ শক বাঙ্গলা ১৩০৯ সাল চলিতেছে। তাহা হইলেই জানা গেল যে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহা

নিয়মে এই সকল ঘটনা হয় তাহা আমাদিগের জ্ঞানাতীত; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই। আবার যদি কেবল আমাদিগের শরীরের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমেশ্বরের যে ইহাতে আশ্চর্য্য কৌশল আছে, তাহার আর কিছু মাত্রই সন্দেহ থাকে না; ইহাতে অতিরিক্তও কিছু নাই ও অসম্পূর্ণও কিছু নাই। কর্ম্মের নিমিত্তই কি, আর শোভার নিমিত্তই বা কি প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গই যথোপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন আছে। আমাদিগের শরীর যে কেবল এক কর্ম্মের নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকেতেই পরমেশ্বরের অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা জ্ঞান ও করুণার স্পষ্টরূপে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত সামান্যরূপে বলাও অল্প ব্যাপার নহে। অতএব ও বিষয় এস্থলে কিছুই উল্লেখ করা গেল না।

আমাদের শরীর ও মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে আমাদের চলৎশক্তি আবশ্যক করে তাহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবেক। কিন্তু এই একের সিদ্ধির নিমিত্ত কতপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হইয়াছে, কত অস্থি শিরামাংস পেশী সকল তাহারই জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য যন্ত্র নিত্য চালনাদ্বারা শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেই নিমিত্তে আমাদিগের অশেষ প্রকার অঙ্গ প্রস্তুত আছে;—কেহ আমাদিগের গলায় আহারীয় দ্রব্য সকল ধারণ করিতেছে, কেহ উহাকে চূর্ণ করিতেছে, কেহ উহাকে জীর্ণ করিতেছে, কেহ বা আবার ঐ পুষ্টিকর সত্বকে দেহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিতেছে এবং শরীরের চালনাদ্বারা যে কোন অংশের যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ঐ সত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ

করিতেছে।

এই সকল অঙ্গ প্রত্যেকেই এমত প্রকার উপযুক্ত স্থানে আছে, যে, যেযে কর্ম্মের নিমিত্ত পরমেশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকল করিতে ইহারা বিলক্ষণরূপে সক্ষম, অতএব এমত প্রকার কৌশল যখন আমরা প্রতি অঙ্গেতেই দর্শন করিতেছি, তখন কি আমরা বলিতে পারি, যে, এমত আশ্চর্য্য কৌশল আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে? যেমন কোন কোন বিদ্বানেরা কহিয়া থাকেন। আমরা যখন একটা ঘড়ি বা একটা অট্টালিকা কিম্বা একটা বাষ্পীয় জাহাজ দেখিলে মনে করি, যে ইহা কখন আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তখন আমরা কি সাহসে ইহা বলিব, যে, মনুষ্যরূপ মহাযন্ত্র আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।—অতএব এই প্রকার তিনি সকল ভূতেরই সৃষ্টিকর্ত্তা।

তৈল ব্যবহার। *

তৈল চর্ব্বি ও ঘৃত এই তিন পদার্থ এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তৈলের যে তিনটি ধর্ম্ম পরে উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা সামান্যতঃ তিন পদার্থেই সমভাবে আছে বলিয়া ঐ তিন পদার্থকেই এক পর্য্যায়ে ধরা যাইতেছে। যেমন এক ভালবাসা গুরু ব্যক্তিতে ভক্তি, সমানে প্রেম, কনিষ্ঠে স্নেহ; আধার ভেদে নামভেদ মাত্র। এক তৈল শব্দ প্রয়োগেই অপর দুই পদার্থকে বুঝিয়া লইতে হইবে। তিল বা সর্ষা প্রভৃতির ভিতর হইতে আসিলে তেল হয়, দুধের ভিতর হইতে আসিলে ঘৃত এবং মাংসের ভিতর হইতে আসিলে চর্ব্বি হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আমার বক্তব্য বিষয়ে ধর্ম্মগত ভেদ নাই, রাসায়নিক ভেদ থাকিতে পারে। সে তিনটী ধর্ম্ম কি? একটি ধর্ম্ম যে আলো করে, দ্বিতীয় পিচ্ছিল করে, তৃতীয় বিনাশের মুখ হইতে রক্ষা করে (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে preserve করে)।

প্রথমতঃ, অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে কার্য্য নির্ব্বাহে যেরূপ অসুবিধা ঘটে, তাহা সকলেই জানেন। আলোকময় হইলে জগতের কত-প্রকার সুবিধা তাহা লিখিয়া শেষ করিবার নহে। আলোক যেরূপ সুখপ্রদ ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদক, তাহা সামান্য উপকারের বিষয় নহে। তেলের সাহায্যে যে আলো জ্বলে তাহা

* ১৭৮৫ শকে লিখিত।

আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, পিচ্ছিলকর কোন বস্তুতে মর্চে ধরে না। যখন নষ্ট হইতে থাকে তখন সে বস্তু বাস্তবিক মরচে অর্থাৎ মরিতেছে। 'মর্চে' এবং মরচে এ দুয়ের কেবল যতি (accent) গত ভেদ। 'ম'র উপরে accent পড়িলে মরচে অর্থাৎ মরিতেছে বুঝায়, নতুবা কলঙ্ক অর্থে গ্রহণ করে। তৈল সংযোগ করিলে, মর্চে ভাগ অপসৃত করিয়া পিচ্ছিল করিয়া দেয়। এই জন্য, লৌহের যত কল কব্জা এবং গাড়ির চাকা প্রভৃতিতে তৈলের ব্যবহার।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যকে রক্ষিত করা। এই ধর্ম্ম বশতঃ মাছ তৈলে ভাজিয়া রাখে। কোন মৃত জন্তু তৈলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে দীর্ঘ কাল অবিকৃত থাকে। ফলমূলাদি তৈলে ভিজাইয়া আচার করিয়া খায়।

এখন শরীরে তৈল প্রয়োগ কিরূপ উপকারী দেখা যাক। বাল্যাবধি প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত শরীরের যে তিনটি অবস্থা ঘটে, তাহার স্থূল বিবরণ না জানিলে, প্রয়োগের উপকারিতা সুন্দর বোধগম্য হইবে না। অতএব শারীরিক সেই তিনটি অবস্থা ও তৈলের সদসদ্ভাবে যেরূপ শুভাশুভ সংঘটিত হয়, তাহা লিখা যাইতেছে।

নবপ্রসূত সন্তান যে শরীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে বাহির হইতে কেহ রক্ত মাংস প্রভৃতি লেপন করিয়া বর্দ্ধিত করে না, কিন্তু তাহা খাদ্য দ্রব্যের উপযোগে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শরীরের প্রতিক্ষণে জন্ম, প্রতিক্ষণে মরণ। বাল্যাবস্থায় জন্ম মরণের জমাখরচের মধ্যে খরচ অপেক্ষা জমা বেশী দেখা যায়। ইহাতে অবধারণ হয়, যে, বাল্যাবস্থায় পাকযন্ত্রের (অর্থাৎ ঘানির)

বল থাকায়, ভুক্ত অন্ন হইতে তৈলাংশ সার উদ্ধৃত হইয়া, শরীরে খরচ অপেক্ষা জমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কোন নির্জ্জীব বস্তুতে ঘানির ন্যায় পাকযন্ত্র না থাকায়, স্বতই তাহার ক্ষতি পূরণের উপায় থাকে না। দেখা যায়, খড়ম পায়ে দিলে এক বৎসরে উহার কিয়দংশ ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর পূরণ হয় না। কিন্তু তদপেক্ষা শিশুর কোমল শরীরের নানারূপ ব্যবহারেও ক্ষয় হয় নাই এমন নহে। ঘানি যন্ত্রের বলে, সে ক্ষতি পূরণ হইয়াও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে। ইহাতে সপ্রমাণ হইল বাল্যাবস্থায় খরচ অপেক্ষা জমা বেশী।

এখন তৈলের যে তিন ধর্ম্ম প্রথমে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা বালকের শরীরে কিরূপে কার্য্য করে আলোচনা করা যাক।

তৈলের প্রথম ধর্ম্ম, আলো করা। বালকের শরীর দেখিবা-মাত্র বোধ হয় যে তৈলের প্রথম ধর্ম্ম যে আলোর স্ফূর্ত্তি, তাহা যেন বালক শরীরে চক্‌চক্ করিতেছে—চক্ষু জ্যোতিষ্মান্, শরীরে একটু টোপ খায় নাই; তৈলপূর্ণ প্রদীপ যেমন দপ্‌দপ করিয়া জ্বলে, তেমনি লাবণ্য জ্যোতিতে যেন আলোকময় হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ধর্ম্ম, পিচ্ছিল করা। যেমন কোন পিচ্ছিল স্থানে পা পড়িলে, পা স্থির থাকে না, সেইরূপ ছেলেরা সর্ব্বদাই অস্থির; শিশুরা যে সময় চলিতে পারে না তখনও তাহাদের সর্ব্বদা অঙ্গ-চালন হয়—তাহা তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্মের দরুন।

তৃতীয় ধর্ম্ম, নাশের মুখ হইতে রক্ষা করা। বাল্যবস্থায় স্বভাবত বৃদ্ধির দিকে যত টান থাকে, ক্ষয়ের দিকে তত নহে।

যৌবনাবস্থায় শরীরের ভাব কিরূপ থাকে দেখা যাক:—

এ অবস্থায় কিছু কাল জমাখরচ সমান চলে। যেমন জোয়ার ভাটার মধ্যে থমথমার অবস্থা। এ সময় ঘানির বল সমভাবে থাকায়, ক্ষয় বৃদ্ধি সমভাবেই থাকে।

এখন পূর্ব্বসঞ্চিত তৈল যাহা কাঁড়ায় ছিল, তাহা যদি অন্যায় রূপে অপচয় না করা যায়—বকচরের তৈল কিছু অপচয় হয় হউক যদি জলকরের তৈল অপচয় না করে—তবে যৌবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তৈলের তিন ধর্ম্মই তাহাদের প্রবল থাকিতে পারে। আর যদি আমোদের লোভে জলকরের তৈল পর্য্যন্ত অপচয় করিয়া ফেলে তবে অকালে প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। সাবধান যেন তৈল বৃথা ব্যয়িত না হয়।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্মে যুবারা ইতস্ততঃ উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে থাকে তখন লোকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে "হুঁ! ইহার বড় যে তেল হয়েছে।" আবার কোন কার্য্য আটক পড়িলে তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া অনেক চতুর ব্যক্তি কার্য্য উদ্ধারের জন্য পাদদেশে অথবা শিরোদেশে তৈলদানের ব্যবস্থা করেন।

এখন বৃদ্ধাবস্থা আসিল; ঘানির আর তেমন বল নাই—ভুক্ত বস্তুর তৈলাংশ পৃথক করিতে পারে না। এই জন্য তৈল ও খইল একত্র নির্গত হইয়া যায়। অজীর্ণ দোষ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাভ্যাস বশত আহারের পরিমাণের বিচার থাকে না। কি পরিমাণ খন্দ ঘানি বহন করিতে পারে, তাহার বিচার না থাকায়, সর্ব্বদাই ঘানির পীড়া উপস্থিত হয়। যদি পূর্ব্ব সঞ্চিত তৈল অন্যায় রূপ অপচিত না হইয়া থাকে তবে এসময় কিছু কাল প্রদীপ জ্বলিতে পারে। তৈলক্ষয়ে এ সময় কিরূপ অবস্থা ঘটিবে,

তাহা ভাবিলে শোকের উদ্দীপন হয়। এখন আর সেরূপ জ্যোতি নাই, আলোক মিট্‌মিট করিতেছে, শরীরের লাবণ্য গিয়া এখন ক্রমেই "বন্য" ভাব উপস্থিত হইতেছে; চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তিরহিত।

দ্বিতীয়, পিচ্ছিলতার অভাবে বালিশের মতন এক স্থানেই পড়িয়া আছে,—উদ্যমবিহীন।

তৃতীয়, ক্রমেই নাশের মুখে গিয়া পড়িতেছে; রক্ষার ভাব সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশে এত তৈলের ব্যবহার কেন, সে বিষয় একটু অনুসন্ধান করা উচিত।

বঙ্গদেশের লোক বড় ঝোলপ্রিয়;—যেমন ঝোল দুধ, ঘোলের ঝোল, মাঝের ঝোল ইত্যাদি। এই জন্য ইহাদের শরীর বড় ঝোলা। যাহা কিছু ঝুলিবার তাহা অল্পবয়সেই ঝুলিয়া যায়। শরীরের বাঁধনী ঢিলা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্য হইতে ঘানি যন্ত্র দ্বারা যে পরিমাণ তৈল সংগৃহীত হয়, তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে জীবনের তৈল সংগ্রহ হয় না। এই জন্য বাহির হইতে তৈলমর্দ্দনের প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। এই হেতু বঙ্গদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রায় সমস্ত রোগেই ভিন্ন ভিন্ন পাকতৈল ব্যবহারের বিধি আছে। বোধ হয় তৈল মর্দ্দনে, দ্বিবিধ হিত সাধন। প্রথমতঃ, আমাদের বঙ্গদেশে সেঁতসেঁতে গ্রীষ্ম এজন্য এখানে বহু প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া, নানারূপে শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে দেখা যায়, আমাদের লোমকূপ সাক্ষাৎ কূপস্বরূপ। অদৃষ্টগোচর কীটাণু সকল সেই কূপদ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বহু প্রকার রোগের

উৎপাদন করে। সংসারে দৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা অদৃষ্টের ভাগই অধিক। যখন কোন কার্য্যের কারণের অনুসন্ধান হয়, তখন কারণটা দৃষ্টি গোচরে থাকিলে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হই, কিন্তু সে কারণ যদি অদৃষ্ট ভাগে থাকে তবে অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া প্রতিকার চেষ্টায় বিমুখ হই। লোকে অদৃষ্টকে কপাল বলিয়া থাকে, কিন্তু কপালে যে কিছু লেখা থাকে, এমন বোধ হয় না। দৃষ্টিগোচরে কারণ পাইলেই লোকের তৃপ্তি, নচেৎ অদৃষ্টের উপর বরাত। অতএব অদৃষ্ট কীটাণু শরীরের ভিতর লোমকূপ দ্বারা প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে তৈল মর্দ্দন দ্বারা লোমকূপ রুদ্ধ করিয়া রাখা প্রচলিত। দ্বিতীয়, বঙ্গদেশ গ্রীষ্মপ্রধান; যদি বাহিরের তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে পায়, তবে অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইয়া শরীরের পীড়া জন্মিতে পারে এবং শরীরের ভিতর হইতে তাপ বহির্গত হইয়া, স্বভাবিক তাপের লাঘব করিতে পারে। এই উভয় দোষ নিবারণের নিমিত্ত তৈল-মর্দ্দন, তৈলের আবরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত। *

আর্য্য হিন্দুরা অতি আদিম কালে যে চলিত ভাষায় কথা-বার্ত্তা করিতেন, তাহাই বৈদিক ভাষা। তাঁহাদের সহজ ভাষায় তাঁহারা যে সকল কবিতা প্রস্তুত করিতেন, তাহাকেই ঋক বলিতেন। ঋক কিনা ছন্দ, কবিতা। যতদিন উচ্চভাবের কবিতা বা গাথা প্রস্তুত হয় নাই ততদিন ভাষা স্রোতে চলিয়া যাইতেছিল, কেহ তাহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই, যেই ভাবুক ঋষি প্রস্তুত দেবভাবসম্পন্ন এবং কল্পনাময় কবিত্বরসান্বিত ঋক-সকল লোকের হৃদয়াকর্ষণ করিল অমনি সেই ভাষা ও তাহার গঠনপ্রণালীর প্রতি ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি যাইতে লাগিল। ক্রমে যত সেইরূপ ভাষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি তাহার মধ্য হইতে ভাষার একটা নিয়ম প্রকাশ পাইতে লাগিল। আবার যতই সেই সকল নিয়ম ধরা পড়িতে লাগিল, ততই সেই ভাষার একদিক থেকে যেমন উন্নতিও হইতে লাগিল, তেমনি আর এক দিক থেকে তাহার অষ্টাঙ্গ নিয়মসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বা-সের উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাস্তবিকই মৃত হইল। মনুষ্য যেমন মৃত হইয়া, আত্মজ সন্তান সন্ততি দ্বারা জীবিত থাকে, বৈদিক ভাষাও সেইরূপ মৃত

* এই প্রবন্ধ রচনার তারিখ জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা "বঙ্গপ্রাকৃত"র সমসাময়িক রচনা।

ভাষায় পরিণত হইয়া নানা উপভাষারূপ সন্তান সন্ততি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যেমন অস্থি সকল পুষ্ট এবং গ্রন্থি সকল আড়ষ্ট হয়, শরীর চলিতে বলিতে অক্ষম হয়, ভাষা সেইরূপ যখন আসন্ন দশায় উপস্থিত হয়, তখন অতিমাত্রায় ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ হয় এবং মনের ভাব, যাহা সহজে সতেজে উদয় হয়, তাহা সেই ভাষার দ্বারা তখন বাহিরে তেমন ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। তখন সে আপনার সন্তান সন্ততিগণের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সহজেই মৃত হয়।

বৈদিক ভাষা যখন বাহুল্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া সংস্কৃত হইতে হইতে ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইল, সেই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই সাময়িক শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহারাই সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলেন। ক্রমে পুরাণ বৈদিক ভাষায় রচিত বিষয়সমূহের অর্থবোধ মর্ম্ম এবং প্রবাদ সকল লোকের স্মৃতি হইতে দূর হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই সকল জীবিত রাখিবার জন্য আকুল হইলেন,—উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের সহিত কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহা কখন অসম্পন্ন থাকে না। সকল অভাব মোচন করিতে সক্ষম এমন সব প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণেরা উদয় হইলেন। সংস্কৃত ভাষা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, ব্রাহ্মণেরা সেই উদ্দেশে সূত্র রচনা করিয়া, সেই সকল মালা গাঁথিয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নিয়মাবলী বাহির হইল, তাহার অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়িল, তাহা পণ্ডিতদিগেরই আয়ত্তে আসিল। যাহারা অন্য ব্যবসায়াবলম্বী তাহাদিগের সাধারণ আয়ত্তে আসিতে পারিল

না। তাহাদিগের হস্তে সেই একই বৈদিক ভাষা প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত যে প্রথমেই এককালে ভিন্ন হইয়াছিল তাহা নয়; ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল উহা এক পথে যাইতে লাগিল ইহা একপথে যাইতে লাগিল, যে পর্য্যন্ত না ঐ প্রাকৃত ভাষা নিজে আবার বহুদূরব্যাপী এবং প্রণালী ও নিয়ম-বদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভাষার জনক হইয়া দাঁড়াইল।

একই ভাষা আবার পণ্ডিতদিগের নিকট একরূপ হয়, মধ্যমবিৎদিগের নিকট একরূপ হয়, আবার ছোট লোকদিগের নিকট একরূপ হয়। নগরে এক প্রকার থাকে, আবার দূর দূরস্থ পল্লিগ্রামে রূপরূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষার দুরূহ প্রণালী এবং নিয়ম সকল প্রাকৃত ভাষাতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিল না। ইতর লোকের মধ্যে ভাষা যাহাতে সহজ হয়, এইরূপ ভাবে দাঁড়াইল। যেমন সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন আছে, প্রাকৃতে একবচন বহুবচন মাত্র রহিল, সংস্কৃতে বিভক্তি আছে, প্রাকৃতে দুটী একটী বিভক্তি রহিল। অপর বিভক্তি সকল কথার যোগে ব্যক্ত হইতে লাগিল। আর সংস্কৃতে যে সকল কঠোর উচ্চার্য্য শব্দ, তাহা অনভ্যস্ত ইতর লোকদিগের মুখে কোমলতায় পরিণত হইল। অর্থাৎ অশিক্ষিত ছোট লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা যেরূপে থাকিতে পারে তাহাই প্রাকৃত ভাষা।

আর্য্যেরা এদেশের জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া আপনার গৌরবে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নিজের ভাষার উপরেও গৌরব অনুভূত হইল। সুতরাং বিজিতদিগের অথবা অন্য কোন জাতির ভাষা এমন কি শব্দ পর্য্যন্ত তাহাতে মিশ্রিত করেন নাই। আপনাদের ভাষার মধ্যে

অপর ভাষার কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণে অতি কটু লাগিত। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় অতটা কড়াকড়ি রহিল না। যে হেতু আর্য্যজাতি যত হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তত নানা জাতির সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণও হইল। এই সঙ্গে তাহাদের অনেক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ না করিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু তাহাতে কটু শুনিতে লাগিত না কারণ সংস্কৃত যেমন শিক্ষিতদিগের ভাষা, উহাতে যেমন কিছুই অপর সহ্য হয় না, প্রাকৃত সেইরূপ অশিক্ষিতদিগের ভাষা ইহাতে "যা সওয়াইবে তাই সয়।" কিন্তু ঐ প্রাকৃত, কালে যখন আবার একদল শিক্ষিতের ভাষা হইল, উহাতে যখন ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি পুস্তক সকল রচনা হইতে লাগিল, উহার যখন ব্যাকরণ তৈয়ারী হইয়া গেল তখন আবার উহাতে অন্য সামগ্রী প্রবেশ করান কঠিন হইয়া উঠিল।

সংস্কৃত প্রাকৃতের ভাব আমরা বাঙ্গলা ভাষার উপমায় বেশ টের পাইতেছি। আমাদের বাঙ্গলা ভাষার গঠন এখনো দাঁড়ায় নাই, এখনো স্রোতের মুখে আছে, এখনো ইহার ব্যাকরণ কিছুই তৈয়ারী হয় নাই। মিথিলা দেশের হিন্দি এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা আকারে পরিণত হয়। মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদিগের দ্বারা প্রথম বাঙ্গলা এক রকম দাঁড় করান হয়। তারপরে ধর্ম্ম-সংস্কারক চৈতন্যের পরে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বাঙ্গলা ভাষার আদর হয়। তাহার পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়, উহার অনেকটা উন্নতি হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে বর্ত্তমান ভাবে দাঁড় করান রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ধরিতে হইবে। ধর্ম্মের আলোচনা ভাষাতে আন্দোলিত না হইলে, সে ভাষার মর্য্যাদা

হয় না। আর ধর্ম্মের আন্দোলনের সময় যত প্রতিভাসম্পন্ন লোক উদয় হয়, এমন অন্য কোন সময় হয় না। ধর্ম্মদ্বারা নাকি লোকের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত টান পড়ে, সেই জন্য ধর্ম্মের অভাব পূরণ করিবার জন্য মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়, সুতরাং সেই সময়ের উপযোগী মনুষ্যেরা আসিয়াও জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে যে মহা অভাব সকল মনে হয়, ক্রমে ক্রমে দেখি, যে সে সব অভাব মোচন হইতে চলিয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষা যে রকম দেখিতেছি, ইহার যেরূপ উন্নতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার অনেকটা প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার শিক্ষিত নাগরিক-দিগের এবং অশিক্ষিত পল্লিগ্রামের লোকদিগের ভাষার আরো প্রভেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চ-লের কথা আমাদের বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়। কোন কোন কথা আমরা বুঝিতে পারিই না। তাহাদের ভাষায় ও সাময়িক পত্রাদির ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। মুসলমান দাঁড়িমাঝি-দের যে অল্প সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক বটতলায় প্রকাশ আছে, তাহা পড়িলেই ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের কথিত ভাষা আবার উহা অপেক্ষাও কঠিন। আবার এই একই বাঙ্গলা ভাষা আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে এতটা বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে, যে, এই জন্য বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে আসামী ও উড়িষ্যা ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা মধ্যবাঙ্গলার সহিত আসাম ও উড়িষ্যার, সহৃদয়তার কতকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও যাহা সাদৃশ্য আছে ঐ ঐ ভাষার পুস্তক সকল বাহির হইতে লাগিলে উহারা স্বতন্ত্র ভাষাতে পরিণত

হইয়া যাইবে। সাময়িক পত্রাদিতে যেরূপ সচরাচর লিখিত হয় তাহা যদি সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদর্শ মনে কর তাহা হইলে এখন আমরা যেরূপে কথা কহি তাহা হইবে ভদ্রপ্রাকৃত। নীচপ্রাকৃতও অনেক প্রকার আছে। আমরা যেমন করিয়া কথা বলি, সেই রকম করিয়া যদি লিখি, তাহা হইলে আর সহস্র বৎসর পরে কোন পণ্ডিত যদি এই দুই ভাষা (কথিত ও লিখিত ভাষা) মিলাইয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার মহা ভ্রম হইবে। তিনি মনে করিবেন মৈথিলী-হিন্দি ভাষা হইতে এই দুইটা স্বতন্ত্র ভাষা বাহির হইয়াছে। সংস্কৃত বঙ্গভাষার অপভ্রংশ যে প্রাকৃত বঙ্গভাষা তাহা তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া উঠা কঠিন হইবে। যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত নয়, কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র ভাষা।

বেদের সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ, উপনিষদের পর ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিবার জন্য সূত্র সকলের সৃষ্টি। তাহার পরে গৃহ্যসূত্র বা স্মার্ত্তসূত্র, তারপরে মনুস্মৃতি, পরে রামায়ণ মহাভারত, তাহার পর পাণিনি ব্যাকরণ। রামায়ণ মহাভারত পাঠে বেশ বোধ হয় পাণিনি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উহাদের শ্লোকের সকল ক্রিয়া সন্ধি প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় নাই। মনে কর মহাভারতে এক জায়গায় আছে,

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃর্হসি দেব সোঢ়ুং॥

এখানে 'প্রিয়া' শব্দের ষষ্ঠীতে 'প্রিয়ায়াঃ' হয়। 'প্রিয়ায়াঃ'র বিসর্গান্ত আকারের পরে 'অর্হসির' অকার থাকাতে বিসর্গের লোপ হওয়া উচিত, কবি তাহা করেন নাই। সংস্কৃত তখন

চলিত ভাষা থাকাতে ব্যাকরণের তাবৎ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। এইরূপ রামায়ণে "করোমি" স্থানে অনেক সময়ে "কুর্ম্মি" দেখিতে পাইবে। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণেরা ঐ সকল স্থলে ভাষার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া ঐ সকলকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া বলিয়াছেন। আবার দেখা যায়, সংস্কৃত সাধু ভাষার মধ্যে অপভ্রংশ-প্রাকৃত শব্দও সংস্কৃত-রূপে চলিত হইয়া গিয়াছে। যেমন বেদের একটা অভিধান আছে তাহাকে 'নিঘণ্টু' বলে, কিন্তু 'নিঘণ্টু' শব্দ প্রাকৃত; 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অপভ্রংশ নিঘণ্টু হইয়াছে। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ নিঃশেষেতে গাঁথিয়া ফেলা অর্থাৎ এক এক অর্থের যত শব্দ তাহাদের এক এক শ্রেণীতে বাঁধিয়া ফেলা। মহাভারতে দেখ শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক 'গোবিন্দ' শব্দ চলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা 'গোপেন্দ্র' শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ বই আর কিছুই নয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পাণিনির পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কালিদাসের সংস্কৃত। যদিও কালিদাসের গ্রন্থেও ব্যাকরণদোষ দুই একটা না পাওয়া যায় যে, তাহা নয়।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে যে যে সম্বন্ধের কথার উল্লেখ করিলাম, এ সকলেরই উদাহরণ বাঙ্গলাতে ঢের ঢের পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা হইতেছে যে, আমরা বঙ্গভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ না করিয়া ফেলি, কিন্তু ভাষার স্বাধীনতার দ্বার যেন মুক্ত রাখি, তাহা হইলে যদিও ইহার নিয়ম বদ্ধ হইতে দেরী লাগিবে কিন্তু ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সারবান হইয়া পণ্ডিত মূর্খ উভয়েরই অনুকূল হইবে।

সেই পুরাকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সমকালীন ভিন্ন ভাষারূপে প্রচলিত থাকিবার আর এক কারণ এই ছিল যে, পণ্ডিতদিগের মূর্খের সহিত বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল না, আর দূর দূর দেশে যাতা-য়াতেরও সুবিধা ছিল না। আর্য্যেরা যত হিন্দুস্থান জয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা আপনাদের সমগ্র জাতি হইতে দূরে পড়িতে লাগিলেন, ততই সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইবার সুবিধা হইতে লাগিল—তাহাকে কেহ প্রতি-বন্ধক দিয়া রাখিতে পারিলেন না। যদি সে সময় লেখা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ দূরতার অভাব মোচন হইত। মহাভারতাদির সময় লেখার প্রচার হইলেও উহা বহুপরিশ্রমসাধ্য বলিয়া এবং পুঁথির অনাটন বলিয়া সাধারণের অগোচর থাকিত। সমস্ত বহুবিস্তৃত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখা ইহা কি বৃহদ্ব্যাপার! তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কি কৃতজ্ঞতার পাত্র! এমন আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন লেখা ও মুদ্রাযন্ত্রের বহু প্রচার জন্য বঙ্গভাষার যেমন উন্নতিও আশা করা যাইতে পারে উহা যে দীর্ঘ-জীবী হইবে তাহারও আশা হয়।

বঙ্গপ্রাকৃত। *

মাখন।—কলিকাতা নগরে 'মাখন' বলে, পল্লীগ্রামে প্রায় সকল স্থানেই 'ননী' বলে। সংস্কৃত 'নবনী'র অপভ্রংশ 'ননী' হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। 'মাখন' কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, ঠিক করা কঠিন। বোধ হয় 'মন্থন' শব্দ হইতে প্রথম 'মাথন' হইয়াছিল, তারপরে 'থ'র স্থানে 'খ', হইয়া মাখন হইয়াছে। কলিকাতায় মাখন, মাখম দুইই বলে;—ন অনুস্বার হইয়া মাখম উচ্চারণ হয়।

মাঠোদই।—যে দধিকে মন্থন করিয়া মাখম্ তুলিয়া লয়, তাহাকে 'মাঠো' বা 'মাঠা' দই বলে। মন্থন হইতে মাথন পরে 'থ'র স্থানে 'খ' না হইয়া 'ঠ' হইয়াছে। বিশেষণ শব্দের 'ন' লোপ হইয়া বিকল্পে আকার হইয়া যায়। এই নিয়মে মাঠন শব্দ হইতে মাঠা হইল; যেবারে আকার না হয়, সেবার মাঠ (মাঠো) হইল।

* পূজনীয় পিতৃদেব বহুপূর্ব্বে—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই প্রবন্ধটীও তাঁহার বিজ্ঞানের খাতায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার খাতায় অত্যল্প অংশমাত্র পাইয়াছি।—দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি এ সম্বন্ধে আরও কোথায় লিখিয়া থাকিবেন, অথবা লিখিবার ইচ্ছা ছিল ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে নাই।

মাঠ।—'মাঠ' যাহার অর্থ ময়দান, তাহা বোধ হয় 'রোমন্থন' হইতে হইয়াছে। 'রো' কোনরূপে লোপ পাইয়াছিল, পরে 'মন্থন' স্থানে 'মাঠ' হইয়াছে, অর্থাৎ গরুদিগের রোমন্থনের স্থান।

দই।—'দধি' 'দহি' হইয়াছিল। বাঙ্গলা প্রাকৃতের নিয়ম এই যে, যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইয়া যায় তাহাদের অন্তে ও মধ্যে প্রায় হকারের লোপ হয়। 'দহি'র হ লোপ হইয়া 'দই' হইল।

পনা।—পনা, যেমন দুষ্টুপনা; 'পনা'র উৎপত্তি বোধ হয় 'প্রবণ' থেকে। 'প্রবণ' হইতে 'পন' হইল। তারপরে, তৎগুণ-বিশিষ্ট অর্থে বঙ্গসংস্কৃতের যেমন 'ত্ব' বা 'তা' হয়, বঙ্গপ্রাকৃতে সেইরূপ আকার হয়। পন শব্দে আকার যোগ হইল, পনা হইল। 'দুষ্টপনা'র অর্থ দুষ্টুমি বা দুষ্টপ্রবণতা।

ষড়্করা।—'ষড়যন্ত্র করা' থেকে 'ষড়্করা'; 'ষড়্করা' থেকে 'ষাট্করা' হইয়াছে।

পিদিম।—'প্রদীপ' থেকে 'পদীপ' হইয়াছে, পরে দ্বিতীয় অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার বসিল,—'পিদিপ' হইল। কেহ কেহ 'পদিম' কেহ বা 'পিদিম' বলে; এস্থলে অন্ত পকারের উচ্চারণ কঠিন বলিয়া পঞ্চমবর্ণ প্রাপ্ত হইল।

সতীন।—সপত্নী = সত্নী। যদি দুই হলন্ত বর্ণের যোগে যুক্তাক্ষর হয় তাহা হইলে প্রথম হলন্ত অক্ষরে শেষের স্বর যুক্ত হয়, যেমন চন্দ্র = চন্দর; এই নিয়মানুসারে 'সত্নী' 'সতীন' হইল।

পিরতি ও পিতি।—'প্রতি'র দ্বিতীয় বর্ণের ইকারের যোগে প্রথম বর্ণে ইকার যুক্ত হইল—প্রিতি হইল। প্রি এই

যুক্তাক্ষরের প্রথমবর্ণে স্বর যুক্ত হইল, যুক্তাক্ষরের শেষ অক্ষর স্বতন্ত্র হইল—প্রি = পির ; প্রতি = প্রিতি = পিরিতি। বিকল্পে মধ্যস্থিত রকারের লোপ হয়। পিরতি = পিতি।

সন্তুষ্ট্ ।—সন্তুষ্ট = সন্তুষ্ট্। যেমন শেষবর্ণে অকার ভিন্ন স্বর থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ণে সেইরূপ স্বর যুক্ত হয়, তেমনি পূর্ব্ব বর্ণে যে স্বর থাকে পরবর্ণেও সেইরূপ স্বর যুক্ত হয়। 'সন্তু'তে যে উকার আছে তাহা আবার 'ষ্ট'তে যুক্ত হইল। সন্তুষ্টু হইল।

অসন্তুষ্ট্ ।—অসন্তুষ্ট, অসোন্তুষ্ট, অসুন্তুষ্টু।

পেরকার ও পোকার।—আদিতে রফলা যুক্ত অকারান্ত অক্ষর থাকিলে যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষরে একার যুক্ত হইয়া পৃথক হয়। প্রকার = পেরকার। যেবার একার যোগ না হয় সেবায় রকারের লোপ হয় এবং প্রথম অক্ষরের অকারের ওকার উচ্চারণ হয় যথা, পোকার।

ছেরম ও ছিরি।—আদিতে তালব্য শয়ে রফলা যুক্ত থাকিলে শ বিকল্পে ছ হয়। যেমন শ্রম = শেরম, ছেরম ; শোম। অকারান্ত রফলাযুক্ত অক্ষর না হইলে প্রথম অক্ষরে একার হয় না। যথা শ্রী = শিরি = ছিরি।

পূব্ ।—রেফের কঠিন উচ্চারণ বশতঃ লোপ হয়। পূর্ব্ব = পূব্ব = পূব্বু = পূব্।

পেচন ও পিচন।—বাক্য-মধ্যস্থিত চবর্গের আদিতে উষ্মবর্ণ যুক্ত থাকিলে শয়ের স্থানে চ হয়। পশ্চিম = পচ্চিম। হ্রস্বস্বরান্ত বর্ণের পর যুক্তাক্ষর থাকিলে প্রাকৃতের অনুরোধে যদি সেই যুক্তাক্ষর হয় তবে সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ

হয় পচ্চিম = পাচিম। উপান্তস্বর অনেক সময় লোপ হয়, যথা পাচিম = পাচম; অকারের ওকার উচ্চারণ হয়, পাচম = পাচোম; অকারকে মুখব্যাদান করিয়া উচ্চারণ কঠোরসাধ্য বলিয়া অকারকে সঙ্কীর্ণ করিয়া একাররূপে উচ্চারণ করে, পাচম = পেচম। ঙ ণ ন ম পরস্পর পরিবর্ত্তসহ। পেচম = পেচন। একারও সঙ্কীর্ণ হইয়া ইকার উচ্চারণ হয়। পেচন = পিচন।

আর একরূপে 'পিচন' সাধা যায়। পশ্চিম = পচ্চিম। দ্বিতীয় অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার যুক্ত হইলে 'পিচ্চিম' হয়; যুক্ত 'চ'য়ের লোপ হইলে 'পিচিম' হইল। উপধা ইকারের লোপে 'পিচম'। ইকারের গুণ একার হইলে 'পেচম'। ম স্থানে ন হইয়া 'পেচন' হইল।

ডেশ্লাই।—দীপ = দিয়া; শলাকা = শলায়া। দিয়া = দিয়ে = দে = ডে। শলায়া = শলায় = শলাই; ডেশলাই = ডেশ্লাই।

আত্মপ্রসাদ। *

যখন কোন ব্যক্তি ভয়ানক সংশয়ার্ণব হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন তাঁহার মনে কতই আত্মপ্রসাদ হয়! তিনি মনে করেন, যে, যখন সমুদ্রস্রোতে পতিত হইয়া আর তাহার কোন ক্রমেই প্রাণের আশা ছিল না, সেই সময়েই এক ভাসমান তরঙ্গ আসিয়া যেন তাঁহাকে কোন সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিল ;—তখন তাঁহার মন কেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়!—তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরেই প্রতি কেমন গাঢ়তর হয়! যেমন কোন ব্যক্তি এক অন্ধকূপে পতিতপ্রায় হইতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কোন এক প্রিয়তম বন্ধু নানা প্রকার সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক যদি তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করে, তখন তিনি সেই বন্ধুর প্রতি না জানি কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েন! সেইরূপ, হে পরমাত্মন! তুমি যাহাকে হস্তদান করিয়া এই অকূল পাথার হইতে কূলে উঠাইয়া লও, তিনি ঐ সময়ে তোমাকে কত প্রকারই ধন্যবাদ দেন এবং তিনি কেবল ধন্যবাদ দিয়াই যে ক্ষান্ত হয়েন তাহা নহে; কিন্তু তিনি অন্যান্য ভ্রান্ত মনুষ্যকেও তোমার ঐ সত্য পথে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হয়েন এবং যখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তখন যে তাহার মনে কেমন এক অনুপম আনন্দের উদয় হয়, যে তাহা কোন প্রকারই ব্যক্ত করা যায় না।

---

* ১২ চৈত্র ১৭৮০ শকে লিখিত

মৃত্যু। *

"ভয়াৎ অস্য মৃত্যুর্ধাবতি"

"ইহার ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে"

বৃক্ষ সকলেরও পত্রহীন হইবার এক নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, উত্তম উত্তম পুষ্প সকলও এক এক বিশেষ ঋতুতে নষ্ট হইয়া যায় এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণও যে কোন্ কোন্ সময়ে আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর হয় তাহাও আমরা বলিতে পারি, কিন্তু হে মৃত্যু! তুমি সকল ঋতুতে ও সকল কালেতেই আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছ। আমরা ইহাও জ্ঞাত আছি, যে কখন্ চন্দ্রকলার হ্রাস আরম্ভ হইবে, কোন্ ঋতুতে পক্ষি সকল একদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবে, বা কোন্ সময়ে শরৎ কালের প্রচণ্ড তপনোত্তাপ ধান্যময় ক্ষেত্র সকলকে হরিদ্বর্ণ করিবে; কিন্তু ইহা কে বলিতে পারে যে, আমি কোন দিবস মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইব।

যখন বসন্ত আসিয়া মন্দ মন্দ বায়ু ব্যজন করতঃ বৃক্ষদিগকে নব পল্লবে সুসজ্জিত করে, সেই সময় কি মনুষ্যের মৃত্যুর কাল? অথবা যে ঋতুতে গোলাব প্রভৃতি উত্তমোত্তম পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতে নিরস্ত হয়, সেই সময় মনুষ্যের মৃত্যুর কাল? না; বৃক্ষ

* ২০ চৈত্র ১৭৮০ শকে লিখিত

সকলের প্রায় একটি একটি কালই নিরূপিত, কিন্তু মনুষ্যের সকল কালই মৃত্যুর কাল।

হে মৃত্যু! তুমি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দণ্ডায়মান আছ, যে অট্টালিকায় নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা সকলেই আমোদিত হইতেছে সেখানেও তুমি আছ, তুমি বন্ধুদিগের পরামর্শস্থলেও আছ, তুমি বটবৃক্ষতলে ক্লান্ত ও বিশ্রাম রত পথিকের নিকটেও আছ, তুমি প্রতি গৃহে গৃহে ও প্রতি পরিবারের মধ্যেও স্থিতি কর এবং ঘোরতর সংগ্রাম স্থলেও তুমি আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কর। তুমি এ পৃথিবীতে একাধিপতি হইয়া এক পুরীর ন্যায় ইহাকে শাসন করিতেছ। তোমার ভয়ে রাজাধিরাজ সম্রাটগণাবধি নীচ জাতি প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই কম্পান্বিত কলেবর হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে।

হে মৃত্যু! তুমি ন্যায়পরায়ণ হইয়া প্রজার সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মতই রাজত্ব করিতেছ। ইহা তোমার দোষ নহে, যে বিদ্রোহী পাপীরা তোমাকে ভয়ানক বলিয়া মানে। তুমি তোমার প্রজা-দিগকে, তাহাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতে কহ; কিন্তু যাহারা তোমার এই সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘন করে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে তদুপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। তুমি মদ্য অহিফেন প্রভৃতি মত্তকারী ও আয়ুনষ্টকারী দ্রব্য সকল গলাধঃকরিতে নিষেধ কর, কিন্তু তোমার বাক্য অবহেলন করিয়া, তাহারা নিত্যই আপন আপন দোষবশতঃ তোমার করাল গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তুমি যুদ্ধেতে, মনুষ্যদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ অতিশয় বিমুখ, কিন্তু তোমাকে যাহারা না ভয়

করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের শত সহস্রকে এক এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়া ফেল; কিন্তু ইহা তুমি রাগান্বিত বা অহিতার্থী হইয়া কর না, বরং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলেরই নিমিত্ত করিয়া থাক। যদি কোন এক দেশীয় লোকেরা তোমার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হইয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, তোমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কর্ম্ম সকল ক্রমাগতই করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের ন্যায় আর কাহারও দুর্ভাগ্য এজগৎ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না। হয় তাহারা যে অবধি তাহাদিগের ধর্ম্মোন্নতি না হয়, সেই পর্য্যন্ত, অন্য এক দেশের অধীনত্ব স্বীকার করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করে, অথবা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন চিত্রকর কতকগুলিন বস্তু উত্তমরূপে চিত্রে অঙ্কিত করিবার কালে যদি তাহার মধ্যে দুটি একটি চিত্র মন্দ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই মন্দগুলিকে পুঁছিয়া ফেলিতে কষ্ট বোধ করেন না, কিম্বা কৃষক যেমন কোন স্থান আবাদ করিতে গেলে, উহার কণ্টকময় ও অন্যান্য হানিকর আগাছা সকল কাটিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না. মৃত্যুও সেইরূপ পাপী ব্যক্তিদিগের দণ্ডদানে বা তাহাদিগের বিনাশ সাধনে কোনরূপ সঙ্কোচ করে না। সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তই পরমেশ্বর এখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহার প্রহরী। মৃত্যুর দণ্ডভয়েই জগতে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

অমরত্ব। *

"ততঃপরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥"

"যিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ অতি মহৎ পরব্রহ্ম এবং যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, আর যিনি একাকী বিশ্বসংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে জানিলে লোক সকল অমর হয়েন।"

হে পরমেশ্বর! কি ঊর্দ্ধদিকে, কি অধোদিকে, কি পার্শ্বে যে কোন স্থানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেইখানেই তোমার মঙ্গল স্বরূপ আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশীয় অনেক অনেক বিদ্বান্‌লোকেরা তোমাকে জানিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও, তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করতঃ তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়াও দেখে না। যাহারা আপনাদিগের পরম পিতাকে এইরূপে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হয়; তাহাদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ ও অকৃতজ্ঞ আর কে আছে।

হে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবন্! যখন অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে ঐ নীল ও নিস্তব্ধ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করি, তখন তোমার অপূর্ব্ব মঙ্গলময়ী স্নিগ্ধপ্রকৃতি আমাদিগের হৃদয়মন্দিরকে পরিশুদ্ধ করিয়া দেয়; আবার যখন প্রভাতে চতুর্দ্দিগস্থ শ্যামবর্ণ

* ১০ই চৈত্র ১৭৮০ শকে লিখিত।

দুর্ব্বাদলের উপর বিমল শিশির বিন্দুগুলি দেখিতে থাকি, তখনও আমাদিগের কৃতঘ্ন মন তোমার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করে। হায়! এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের মনুষ্যেরা তোমার এমন সুন্দর মূর্ত্তি অন্তঃকরণে স্থাপিত করিতে চাহে না। হে পরমাত্মন্! তুমি এ তমসাচ্ছন্ন দেশকে এই মহৎ দোষ হইতে মুক্ত কর।

আমরা মহাভয়ঙ্কর বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝড় বৃষ্টির অভ্যন্তরেও তোমার নাদ শ্রবণ করিয়া থাকি, এবং রাত্রিকালে সুমন্দ বায়ু-বিচলিত বৃক্ষপত্রের সুমধুর শরশর নিনাদে এবং গঙ্গার মন্দ মন্দ কল্লোল ধ্বনিতে মাতার স্নেহবচনের ন্যায় তোমার স্নেহময় বাক্য কর্ণগোচর করি। ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তোমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় এবং নিস্তব্ধ সময়েও তুমি বিদ্যমান থাক। তুমি সকল সময়েই সকল স্থানে বিরাজমান আছ। পরন্তু কতিপয় পণ্ডিত-ম্মন্য লোকেরা অহংকার পরবশ হইয়া তোমার সহিত কোন প্রকারেই আলাপ করিতে ইচ্ছুক হয় না। সুন্দর মনোহর সুগন্ধ পুন্নাগ ও গোলাব চম্পক পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প সকলে তোমার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তোমার প্রতি ভক্তিপ্রবাহ আপনা হইতেই উত্থিত হইতে থাকে, তত্রাপি এমত মনুষ্যও আছ যাহারা ঐ পবিত্র পুষ্প সকল আহরণ করিয়া, তাহাতে তোমার প্রেম অব-লোকন না করিয়া আপনাদিগের জঘন্য বৃত্তি সকল চরিতার্থ করে। এই ধরণীর সুস্বাদু ফল মূলসমূহ ভোজন করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করি, হে অন্তর্যামিন! তুমিই সেই তৃপ্তির কারণরূপে বিরাজমান রহিয়াছ; এবং প্রত্যেক সুখের সময়ে তুমিই ধন্য-বাদের যোগ্য। তথাচ এ প্রকার লোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা কেবল পশুবৎ আহারের সময়েই আহার করিয়া সুখী

ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ভুলিয়াও কোন সময়ে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

হে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর! অসীম নভোমণ্ডলস্থ তারকাগণ মধ্যে তোমার যশঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; ভয়ঙ্কর বজ্রবিদ্যুতে তোমার শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, নিস্তব্ধ সময়েও তুমি বিরাজমান থাক, রমণীয় উষাকালে তোমার সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রিত দেখি, সশৈল বন কাননে তোমার হস্তের চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়; মনোহর ফলপুষ্পে তোমারই করুণা প্রকাশ পায়। আমরা যে দর্শন শ্রবণ ও মননাদি করিতে সক্ষম হই, সে তোমারই কারণে। তুমি আমাদিগের পিতামাতা সুহৃদ্বন্ধু ও আশ্রয়। সকল ঘটনা তোমা হইতেই নিষ্পন্ন হয়, সকল নিয়ম তোমারই দ্বারা নিয়মিত হয়। ভক্তেরা তোমাকে বিশ্বকার্য্যের কারণ অতি মহৎ পরব্রহ্ম জানিয়া তোমাকে সকল ভূতেই গূঢ়রূপে স্থিতি করিতে ও তোমাকে এই বিশ্ব-সংসার পরিবেষ্টন করিয়া থাকিতে দেখেন; এবং তাঁহারা তোমার স্বরূপ জানিয়া ভক্তিভাবে মনের সহিত নিয়ত তোমার উপাসনা করিয়া মৃত্যুর পরে তোমার সহবাস লাভ করতঃ অমর হয়েন।

ঋতুবর্ণনা।

বসন্ত।

বসন্ত সমাগমে সকলই মধুময় ; মনুষ্য দেহের কণ্টকময় শীত-বায়ু এবে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ সাগরের পরপার হইতে মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে অমৃতসার আনিয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিতেছে। অল্প অল্প মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। হৃদয়ে কি আশ্চর্য্য সুমিষ্ট ভাবের সঞ্চার হইতেছে। এমন নূতন, জীবন্ত প্রফুল্লতা আর কোন সময়ে অনুভব হয় না। বৃক্ষসবে পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্রে সুশোভিত। তরুরাজি মুকুলভরে অবনত। মধুকরণে ধরাতল সুসিক্ত। মধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সকলি জীবন্ত, সকলি প্রফুল্ল, সকলি মধুময়। শীতকাতর কাননের সুকুমার পুষ্প এতদিন ম্রিয়মান ছিল ; এখন মলয় সমীরের স্পর্শে সকলে হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতেছে। ঈষৎ উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ এমন অপরূপভাব আর কখন ধারণ করে নাই। কাননের এমন অনুপম শোভা আর কখন নয়ন গোচর হয় নাই। সেই শোভায় আবার সৌন্দর্য্যের সাগরকে মনে হইতেছে। সলজ্জ কমনীয়তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মাধবীলতা প্রফুল্ল কুসুমভরে অবনত হইয়া উপবন আলো-কিত করিয়া আছে। প্রসূননম্র নবমালিকা রসাল তরুর অনুগত

---

* এই প্রবন্ধ ১৭৮৫ শকে লিখিত। এক্ষণ ১৮২৪ শক চলিতেছে।

হইয়া নারীজনকে পাতিব্রত্য শিক্ষা দিতেছে। বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া গগনে অযুত বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। আম্রমুকুলসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সম্মুখে বিকশিত গোলাবক্ষেত্র পরিমলে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। একত্রে এত সৌন্দর্য্য আর কখনও দৃষ্ট হয় না। সমুদয় প্রকৃতিই সরস ও মধুমান। যিনি ওষধী বনস্পতি আকাশ চরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন সেই রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু পরমেশ্বরের হস্ত এখন সকল বস্তুতে দেখিতেছি। এই দক্ষিণ মারুতের সুমন্দ হিল্লোলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতেছে তেমনি জগতে এমন কোন পদার্থই দেখিতেছি না যাহাতে হৃদয় বিগলিত না হয়। এখন মধুকণ্ঠ বিহঙ্গদল প্রত্যাগত হইয়া মধুর-কণ্ঠবিনির্গত সুতানে গান করিতেছে। অদূরে বনস্থলীর বল্লীলতাচ্ছন্ন নিকুঞ্জকাননে কোকিলগণ দিবানিশি কুহুকুহু কূজন করিতেছে। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি যেমন আপনার চিরজীবন সখাকে ধ্যান করেন, ভৃঙ্গগণ তেমনি পুলকিত হইয়া মধুপান করিতে রত। সেই পবিত্র সুন্দরকে ধ্যান করিতে কে না আমাদের অনুকূল? সূর্য্যকিরণে তাঁহার জ্যোতি অনুভূত হইতেছে; বাতাস তাঁহারি সুরভি নিশ্বাস বহন করিতেছে; পুষ্পময় কাননে তাঁহারি শোভা নয়নগোচর হইতেছে।

গ্রীষ্মকাল।

প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে মেদিনী সন্তপ্যমানা। প্রাণীগণ আতপতাপকাতর—নিস্পন্দভাবে আম্রমতকে বিরামের ভিখারী। ত্রিযামার

হিমচ্ছায়া এবং চন্দ্রমার স্নিগ্ধকর এবে স্পৃহনীয় হইয়াছে। ভুজঙ্গ-নিশ্বাসসদৃশ দক্ষিণমারুত কেবল অগ্নিকণা বহন করিতেছে। বিহঙ্গকুল গিরিগুহা কানন ও কুলায়ে মুদ্রিতনয়নে কাতরভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রান্তরস্থিত বটশাখায় একাকী কপোতদুখিনী সুললিত স্বরে দুঃখের গান গান করিতে মগ্ন। ঘোর বিষয়ীরও বিচঞ্চল মন যেন বহির্গত হইতে না পারিয়া ধর্ম্ম ও পরকাল ভাবিতেছে। অদূরে সুনীল আকাশ উত্তপ্ত ধরা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; কুরঙ্গিণী নির্ম্মল সলিল আশায় সেই দিকে ধাবন করিয়া প্রতারিত হইল। বৃক্ষতলশায়ী শুষ্কপত্রসকল বাতাসে ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান। ঈশ্বরানুরাগী সাধুব্যক্তি সতৃষ্ণ হইয়া যেমন তাঁর প্রসাদবারি প্রার্থনা করেন, সেইরূপ প্রাণীমাত্রেই এখন শুষ্ক-কণ্ঠে বর্ষার সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহীব্যক্তি চন্দনসিক্ত তালবৃন্তে বিজনে যেমন অঙ্গ শীতল করিতেছে, যোগীন্দ্রজন সেইরূপ সেই দেবদেবের সহবাসহিল্লোলে হৃদয়তাপ দূর করিতেছেন। কত পাপী উদ্ধার হইল, তথাপি পতিতপাবনের করুণাবারি শুষ্ক হয় না। সাধুসঙ্গ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সহসা পাপীব্যক্তির যেমন অসহ্য বোধ হয়, তেমনি মার্ত্তণ্ডের প্রখর রশ্মি গৃহবহির্গত ব্যক্তির নয়নযুগল ব্যথিত করিতেছে। উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় বিষয়ীর হৃদয় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার ভয়ানক দাবানল সমান তাহার মন কেবল শোকানলে দগ্ধপ্রায়। এখন সকলি অসহনীয়। স্বেদবিগলিত বপু আর কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না। মৃণাল নলিনীপত্র ক্ষণিক স্পর্শে বিশুষ্ক হইতেছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পথিকগণ বৃক্ষতলে অচেতনপ্রায় হইয়া বিশ্রামে রত। তৃষাতুর রাখালগণ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রস্রবণবিনির্গত জলপান

করিয়া আসিতেছে। গাভীবৃন্দ বিটপীর ছায়ায় রোমন্থন করিতেছে; লতাবিতানশায়ী মৃগকুল উন্নত শিরে কাতরতার পরিচয় দিতেছে। প্রান্তরপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণে আকাশ যেন কম্পমান দেখিতেছি। মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণ রাজপথ হইতে রক্তধূলি উড্ডীয়মান করিয়া গৃহ সকল ও মনুষ্যবস্ত্র সিন্দুরময় করিতেছে। নগরবাসীগণ জলবাটিকার শৈবাল-পয়োপরিনিপতিত। বায়স বায়সী নদীজলে অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে জলপানে আকুল। এই গভীর সময়ে সকলি নিস্তব্ধ; কেবল ঈশ্বরের অনাহত নাদ আসিয়া হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া দেয়—কঠোর হৃদয়ীর অন্তরেও বৈরাগ্য সঞ্চার করে। ঋষিগণ গুহা গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপদধ্যানে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন; এমন নিদাঘকালের অগ্নিময় মধ্যাহ্নকাল তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারিতেছে না। শোকানল পাপানল যেমন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি এই ভয়ানক গ্রীষ্মানলও তাঁহাদিগকে বিচঞ্চল করিতে পারে না। এই সমীরণমুখরিত গুহাতলে একমনা হইয়া যাঁহারা সেই ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ প্রসন্নমূর্ত্তি অবলোকন করেন মৃত্যু তাঁহাদিগকে অধীন করিতে পারে না।

হে নগরবাসী ও পুরবাসিনীগণ! তোমরা এই শব্দশূন্য সময়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দরসপানে হৃৎপিপাসা নিবৃত্ত কর এবং সেই দেবদেবের পবিত্র চরণের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ কর।

নব বর্ষা।

আষাঢ় মাসের তরুণ বয়সে রৌদ্রতাপে দিগ্‌বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত। হা জল! হা জল! করিয়া জীবগণের শুষ্ককণ্ঠ অধিকতর শুষ্ক হইতেছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল,—লতাপল্লব মৃতপ্রায় অবসন্ন ও নতশির হইয়া পড়িল, দিঙ্‌মণ্ডল ধূম্রময় হইল। ঘরে বাহিরে সমান তাপ মনুষ্যের কপোলদেশ দগ্ধ করিতেছে। অদ্যাপি বর্ষা নাই। কি হইল এই রবে ধরা পূর্ণ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড বায়ু স্তম্ভিত হইল; পক্ষিসবে নীরবে উন্মুখীন হইয়া বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিল। ক্রমে পশ্চিম দিক্ ছায়াময় হইল। প্রবাহিনীর পরপারে একখানি সুন্দর শ্যামল নবীন মেঘ অল্পে অল্পে আকাশের পশ্চিমাচল আবরণ করিল। বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত ইন্দ্রধনু আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভায় নয়ন রঞ্জন করিতে লাগিল। প্রাণিমাত্রে গগনের এই অনুপম লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে সমুৎসুক। নির্যাতনকারী প্রখর রবি সলজ্জ হইয়া মেঘের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন; এখন বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল গাঢ় মেঘে পরিব্যাপ্ত হইল। চাতকিনী সহর্ষ মনে মেঘের ক্রোড়ে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঈশ্বরপ্রেমী সাধুব্যক্তি পূর্ব্বকথা স্মরণপূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মোহান্ধ ব্যক্তির অজ্ঞানের মধ্যেও এক একটি সাধুভাব যেমন শোভা পায়, তেমনি তরুণ জলধরের শ্যামল অঙ্গে শুভ্র বকাবলী এক্ষণে সুন্দর দেখাইতেছে। কোন অপরিচিত দেশে ব্রহ্মমন্দির

দেখিলে ব্রহ্মপরায়ণের হৃদয় যেমন নৃত্য করে, তেমনি নীরদ-সমাগমে ময়ূর ময়ূরী পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। ক্রমে প্রতিহারী হিমানিল সমাগত বৃষ্টিধারার সন্দেশ আনিয়া দিল। বহুদিন বিরহের পর অভিন্নহৃদয় পুণ্যাত্মারা পরস্পর আলিঙ্গনে যেমন তৃপ্তাঙ্গ হয়েন, তেমনি তাপিতদেহে শীতসমীরণ স্পর্শ করাতে প্রাণীসবে শীতল হইল। অনেকদিন পরে কাদম্বিনী মেদিনীসন্দর্শনে পুলকিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল; মেদিনীও যেন উচ্ছ্বাস দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। অস্ত বজ্রনিনাদ-শ্রবণে চন্দ্র তারকারা ভীত হইয়া যেন আকাশপথে সমুদিত হইল না। অন্ধকার রজনীর ভীষণ আশ্চর্য্যভাবে হৃদয় আচম্বিত হইতেছে। পাপাসক্ত হৃদয়াকাশ যেমন মোহতিমিরান্ধ, অদ্য সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে জগৎ সংসার তেমনি অঞ্জনময় আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি করুণাময় পরমেশ্বর বিপন্ন পথিকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন; দুর্বৃত্ত মূঢ়ের অন্তরেও তিনি যেমন এক একবার স্বীয় জ্যোতি প্রেরণ করেন, তেমনি কনকলতিকা সদৃশ বিজলিদল এক একবার চারিদিক চমকিত করিয়া তাহার পথে আলোক দিতেছে। সাংসারিক প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইলে সাধু সরলহৃদয় সভয়ে যে প্রকার সেই পরমমাতার আশ্রয়ে নিলীন হন, সেইরূপ বজ্রধ্বনিতে বিকম্পমান শিশুগণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুকায়িত হইতেছে। ভক্তের হৃদয়ধামে অবিচ্ছেদে যেমন ঈশ্বরের করুণামৃত বর্ষিত হইতে থাকে, তেমনি শ্রবণমনোহর সুশীতল বারিধারায় ধরাতল সিক্ত

হইতেছে। ভেকের মকমক রবে জনগণের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। প্রচণ্ড মারুত মহাবেগে সৌধশিখরে আঘাত করিতেছে। বিষয়ীরা আশ্রমসুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রায় রত। ভক্তজনও নিশ্চিন্ত হইয়া বিরলে সেই পরম সুহৃদের সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। যাঁহার আদেশে বীভৎস দাবানল উৎকট বজ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারে, যাঁহার আদেশে এক পলকে মহাবর্ষণে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল যাইতে পারে, তাঁহার শরণ ছাড়িয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইবে? হে করুণার সাগর! এই পঞ্চভূতের বিষম সংগ্রামের মধ্যে এই আশ্রমতলে আমি তোমারই গুণগান করিতেছি, তুমি নির্জ্জন কুটীরে অবতীর্ণ হইয়া আশা পূর্ণ কর। আমি যাহা দেখি, আর যে তোমা ছাড়া কিছুই দেখিতে পাই না; সকল শব্দে তোমার স্বর ভিন্ন কিছুই শুনিতে পাই না। প্রভো! এমন নির্জ্জন এমন নিশ্চিন্ত স্থান আর পাইব না; যদি কৃপা করিয়া এই কাঙালের হৃদয়ে আসিয়াছ তবে আর তোমাকে ছাড়িব না। আমি আজন্ম কেবল তোমারি নির্জ্জন সহবাসের অনুরাগী। নাথ! এই বর্ষার সমাগমে আমি বুঝিয়াছিলাম আজ আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হইবে, নবীন মেঘোদয়ে তোমারি উদয় অনুভব করিয়াছিলাম। বারিবর্ষণে তোমার অমৃতবর্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি, আবার বিদ্যুল্লতায় তোমারই নিরুপম সুন্দর জ্যোতিঃ দেখিতেছি। নাথ! আজ চতুর্দ্দিকের ভীষণ গম্ভীর নিনাদের মধ্যে একাকী তোমার সঙ্গে নিবাতকম্পিত শান্তিসলিলে ভাসিতেছি, নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তোমার স্নেহলেপিত বাহুর আলিঙ্গনে নিলীন রহিয়াছি।

ভরা বর্ষা। *

প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ নিদাঘকাল বর্ষার সমাগমে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর ভীষণ আশ্চর্য্য ভাবে হৃদয় আচম্বিত হইতেছে। ঘননীল মেঘাবলী আকাশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া আছে। নিবিড় অন্ধকার যেন জগৎকে অঞ্জনময় করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কনকলতিকা সদৃশ বিজলিদল চমকিত হইতেছে; কড়কড় বজ্রধ্বনিতে মেদিনী বিকম্পমানা;—শিশু-গণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইতেছে। শ্রবণমনোহর শন্‌শন্‌ রবে সুশীতল বারিধারা ধরাতল সিক্ত করিতেছে। ভুজঙ্গের ত্রিবক্রগতি অবলম্বন করিয়া নীরস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। পূর্ণকলেবর স্রোতস্বতী কূলস্থিত মহোচ্চ পাদপসকল উৎপাটন করিয়া প্রবলবেগে সাগরসঙ্গমে গিয়া মিলিত হইতেছে,—যেমন দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মপরায়ণ সাধুব্যক্তি কোন বাধা না মানিয়া সংসারের প্রতিকূলে ঈশ্বরসমীপে চলিয়া যান। ভেকগণ সরসীতটে মক্‌মক্‌ শব্দে প্রাণীগণের নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে। বর্ষা বিদ্যুৎ মেঘ বজ্র পর্ব্বতের অচল অঙ্গে বিষম বলে আঘাত করিলেও উন্নত গিরি বিপন্ন সাধুব্যক্তির ন্যায় সকলি তুচ্ছ করিয়া অবিচ্ছেদে মুক্তবায়ু উপভোগ করিতে দণ্ডায়মান। আবার অদূরে ভূতলে কি ভয়ানক

---

* আমরা পূজনীয় ৺পিতৃদেবের "ঋতুবর্ণনার" অন্তর্গত এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবন্ধাবলীর ভাব দেখিয়া মনে হয় "ঋতুবর্ণনা" তাঁহার সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ভরা বর্ষা'র পর অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি আমরা প্রাপ্ত হই নাই। যে অবধি পাওয়া গিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল।

[illegible] হইল! বুঝি প্রতিবাসীর অট্টালিকা ভীষণ ঝড় বৃষ্টিতে পরাজিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ভরা বরষার এই অচন্দ্রতারকা গভীরা যামিনী প্রলয়কালের হৃদ্বিকারক ভাব অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দেয়। এক্ষণে কোন্ অসাড় হৃদয় সেই "ভয়ানাং ভয়ং" পরমেশ্বরের চরণে শরণাগত না হয়; কাহার কণ্ঠ না বিনীত ভাবে কহিতে থাকে 'হে ভগবন্! বুঝিলাম তোমার সহিত বিরোধ করিয়া কোথাও নিস্তার নাই, উৎকট বজ্র, ভীষণ দাবানলে তোমার আদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারে —তোমার আদেশে এক পলকে ত্রিলোক মহাবর্ষণে উপপ্লাবিত হইতে পারে; পঞ্চভূত তোমার আজ্ঞাধীন দাস।"

দেখিতে দেখিতে প্রাতঃকাল সমাগত হইলে উষাদেবী আজ নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। পূর্ব্বদিক তরুণ ভানুর অভ্যুদয়ে আজ আর রক্তবস্ত্র পরিধান করিল না। প্রকৃতি, মেঘের অবগুণ্ঠনে আজি অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন। লতাপল্লব সকলি নয়নমুগ্ধকর নবীন হরিদ্বর্ণে জীবন্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইতেছে; বায়সগণ কাকা রবে আর্দ্র পক্ষ ধুনন করত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। বিস্তৃত প্রান্তর অপার সাগর সমান জলে ভাসিতেছে; প্রকাণ্ড মৎস্য উল্লম্ফনের পর অগাধ জলরাশির মধ্যে আবার নিমজ্জন করিতেছে। লোধ্র অর্জ্জুন যূথিকা প্রভৃতি চারিদিকে পুষ্পকুমারীগণ মেঘের সহিত হাস্যক্রীড়া করিতে রত। কদম্বস্পর্শী কাদম্বিনী মণিময় বিতানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বৃক্ষতলে ময়ূর ময়ূরী কেকারবে গুহাগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃত্যসুখে মত্ত। নদীর দুই পার্শ্বস্থিত কাছাড় কেতকীপুষ্পের সৌরভচ্ছটায়

আমোদিত। মধ্যে মধ্যে তটপ্রপাতে সরিতের হৃদয় বিদারিত হইতেছে। এই সময়ে এক একবার সূর্য্য উদয় হইয়া ঘননীল মেঘেও অগৌণস্নাতা প্রকৃতির অঙ্গে কিরণ বর্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য ছটা বিস্তার করিতেছে। এমন কালে সকলি অনুকূল। এ সময় মানবহৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দসুখে নিমগ্ন না হইয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে যে কত ভাব হৃদয়কে প্লাবিত করে তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিবে। প্রতি ঘটনার প্রতি পরিবর্ত্তনে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিবার প্রশস্ত সময়। বিধাতঃ! আশ্চর্য্য তোমার কান্তি, মহৎ তোমার অধিকার; আমি এই পৃথিবীতে তোমার মহিমা দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইলাম। তুমি আমার স্তম্ভিত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া শান্তিবারি বর্ষণ কর পুনর্ব্বার তোমার কাছে এই প্রার্থনা।

দীক্ষাগুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। *

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিত যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

হে পারত্রিকপথালোক পরম গুরো! আপনার উপদেশে আপনার দৃষ্টান্তে আমি অমৃত লাভ করিয়াছি, বিনীত ভাবে আপনার চরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি সেই শান্তি-নিকেতনের অধিকারী হইয়াছি। প্রভো! যে দিন যে দিন আপনার চরণে উপনীত হইলাম সেই দিন আমার দুর্ভাগ্য-তামসী নিশার অবসান হইয়াছে; পিতামাতা যেমন আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আপনি তেমনি স্নেহ-বৎসল কোমল ভাবে আমাকে পরম পিতার চরণে নীত করিয়াছেন। আমার কৃতজ্ঞতা যদি পশ্চিমসাগর সমান সুগভীর ও প্রশস্ত হইত তথাপি আপনার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ধারণ করিতে পারিতাম না। সেই জ্যোৎস্নাময় অমৃতপুরের দ্বার আমার নিকট চিরকালই অবরুদ্ধ থাকিত যদি আপনার চরণ ছায়া লাভ করিতে না পারিতাম। আপনার যেমন উদার প্রশস্ত ভাব আপনার দানও

---

* ৺ পিতৃদেব সংক্ষেপে ও সংহতভাবে যে চারিটী সর্গে চারিটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ইহাতে একটু নূতনত্ব আছে। এই প্রবন্ধগুলিতে উপদেশচ্ছলে হৃদয় স্নিগ্ধকারী আদর্শ ছবি প্রকটিত হইয়াছে। ১৭৮৫ শকে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল।

সেইরূপ প্রশস্ত হইয়াছে; আপনি আমাকে দেবদুর্লভ ধন বিতরণ করিয়াছেন। যে কর আপনার প্রসাদে অনন্তের প্রতি উত্থিত হইয়াছে, আমার সেই কর আপনার চরণ সেবায় চির জীবন নিযুক্ত থাকুক; পুত্রের প্রতি পিতার যদি একগুণ প্রভুত্ব হয় তবে আমার প্রতি আপনার শত প্রভুত্ব বিরাজ করুক। আমি আপনার কৃপায় সেই "অপার অমৃতের" কৃপা লাভ করিয়াছি; আপনি উন্নত হইয়া আমার ক্ষুদ্র মনের সহিত সমভাব হইয়াছেন। আমি যে সময় অপার নৈরাশ সলিলে ভাসিতেছিলাম আশার অনিমজ্জ ভেলক দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এক সময় যখন আমি শোকানলে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতেছিলাম তখন আপনি আমার হস্ত ধারণ করিয়া পরম পিতার সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন—আমি পিতার ক্রোড়ে বসিয়া সকল দুঃখ পাশরিলাম। যখন পিপাসু হইয়া আমার আত্মা আপনার শরণাগত হইয়াছিল তখন নির্ম্মল শান্তি সলিল বিতরণ করিয়া আমাকে শীতল করিয়াছেন। এমন নিষ্কাম স্নেহ আমি আর কোথায় পাইব? যে বিনয় এত যত্নে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেই বিনয় আমার মস্তককে আপনার চরণে অবনত রাখুক; আমি ভক্তিভরে আপনাকে প্রাণপাত করিতেছি। আমাকে দুরাচারী হইতে এখন দেখিলেও আপনি আমার প্রতি ঔদাস্য করিবেন না। আমার মঙ্গল অমঙ্গল সকলি আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ হইলেও আপনার শিষ্য—আপনার আদেশ আপনার উপদেশ আমার কণ্ঠহার। আমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ ছিলাম, আপনি আমার চক্ষের আবরণ তুলিয়া আলোক আনিয়াছেন; আমি কর্ণের অধিকারী হইয়া বধির ছিলাম, আপনি

আমাকে যাহা শুনাইবার শুনাইয়াছেন। এ জীবন শূন্য হইয়া যাইত যদি আপনার সহায়ে ধর্ম্মের পথে নীত না হইতাম। আপনি মাতার ধন মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আমি সেই মাতার চক্ষের সম্মুখে পুনর্ব্বার আপনাকে প্রণাম করি।

সমাপ্তোয়ং গুরুভক্তির্নাম প্রথমঃ স্বর্গঃ।

কন্যার প্রতি পিতার স্নেহবচন

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

বৎসে! তোমার প্রফুল্ল মুখকুসুম দুঃখতাপে মলিন না হউক, তোমার হৃদয় ক্ষমার নিলয় হউক। যে প্রকার সুপাত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি তাঁহার অনুগামিনী ও মঙ্গলবিধায়িনী হইয়া চিরজীবন থাকিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিত পুত্রের জননী হও; বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর তোমার জীবনের কণ্টক সকল দূরীকৃত করুন। ধর্ম্মে বিনয়ে লজ্জায় ও পাতিব্রত্যে তোমার মাতার অনুকারিণী হও। শৈশবকাল হইতে তোমাকে অতি যত্নে শিক্ষা দিয়াছি—বিদ্যার মধুর ফল ঈশ্বরে ভক্তি তোমার হৃদয়

অধিকার করুক। গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের সেই গৃহদেবতার পূজা করিবে। কন্যাগণ যে কত স্নেহের ধন বলিতে পারি না, সহজে অবলা তায় অল্প দিনের মধ্যে মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতে হয়। বৎসে! সংসারের গুরুভার তোমাকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে; যদি অনায়াসে তাহা বহন করিবে তবে সেই অবলার বল পরমেশ্বরের নিকট সত্যের বল প্রার্থনা কর। তোমার অন্তঃকরণ পরিমার্জ্জিত হউক, তোমার বাক্য অমৃত বর্ষণ করুক, তুমি নারীকুলের দৃষ্টান্ত হইয়া সংসারে চলিয়া যাও। তোমার সহচরীগণের সহিত সর্ব্বদা স্নেহালাপ করিবে, তাহাদিগকে মধুর ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দিবে এবং অল্পে অল্পে তাহাদের বৃথা সংস্কার ছেদন করিয়া ধর্ম্মের ছায়াতে আনয়ন করিবে। বাল্যকাল হইতে তোমাকে যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে তোমাকে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; তথাপি তোমাকে মনে করিয়া দিতেছি যে, স্বামীর ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া তোমার বিনীত ভাব যেন অন্তরিত না হয়, তুচ্ছ বেশ ভূষাতে মন আকৃষ্ট না হইয়া হিতের প্রতি তোমার কুসুমকর নিয়োজিত থাকে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা করিবে এবং সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও কখন উচ্চ কথা কহিবে না। সন্তান হইলে তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিবে; কুসংস্কার বা কুটিল ভাব অঙ্কুরিত হইবামাত্র সচুম্বন প্রিয়কথা দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ উন্মূলিত করিবে এবং ধর্ম্মের কোমল বীজ বদ্ধমূল করিবে। তোমার স্বামীর মঙ্গলে যেমন সুখ-দ্বিগুণকারিণী হইবে তেমনি অসময়ের দুঃখে সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার হৃদয়ভার লাঘব করিবে। এইরূপে পুত্র কন্যা ক্রোড়ে লইয়া পুনর্ব্বার যখন আমার নয়নের

সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন যেন দেখিতে পাই যে তোমাকে প্রতিপালন করা আমার সার্থক হইয়াছে এবং তোমার মাতা যেন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন 'আমি এমন পুণ্যবতী কন্যার জননী হইয়া কৃতার্থ হইলাম।'

সমাপ্তোয়ং কন্যোপদেশো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

বন্ধুর প্রতি উক্তি

হে নয়নাঞ্জন! অনেক দিন তোমাকে না দেখিয়া যেরূপ কাতর হইয়াছি তাহা তুমি আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। অল্পদিনের মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই আশায় আমার মন আহ্লাদনীরে ভাসিতেছে। বাল্যকালের সৌহার্দ্দি যে কি অমূল্য ধন তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। সংসারে এমন দুঃখ নাই যে সুহৃদের নিকট ব্যক্ত করিয়া হৃতভার না হই; এমন আনন্দ কি আছে যে তোমার সহিত বিভাগ করিলে দ্বিগুণিত না হয়! নয়ন তোমাকে প্রেমাশ্রু উপহার দিবার জন্য টলটল করিতেছে, হৃদয় তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। তোমার স্কন্ধোপরি বাহু দিয়া বেড়াইতে ও মধুর জল্পনা করিতে না জানি কত আনন্দ লাভ করিব। হে প্রাণাধিক! আমাদের প্রতিদিনের কাহিনী স্মরণ হইলে হৃদয় কি করিতে থাকে তাহা বলিতে পারি না—একত্রে আহার

বিহার, একত্রে পুস্তক রচনা, একত্রে অধ্যয়ন, একত্রে উপাসনা ইহার একটীও ভুলিবার নহে। সেই সন্ধ্যারাগলোহিত সময়ে কতদিন নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়া কত কথা কহিতাম, প্রকৃতির আশ্চর্য্য শোভা বিলোকনে মুগ্ধ হইয়া একস্বরে ঈশ্বরের মহিমা গান করিতাম, এবং প্রতিদিন নূতন নূতন ভাবকুসুম সঞ্চয় পূর্ব্বক নূতন হার রচনা করিয়া সেই বরণীয় পুরুষকে উপহার দিতাম। প্রিয় সুহৃদ! বিরহদিবসের যে কত কথা তোমাকে বলিবার জন্য গাঁথিয়া রাখিয়াছি তাহা এই হৃদয়ই জানিতেছে; জীবনের কণ্টকময় পথে কত কষ্টে পরম পিতার পবিত্র ভবনে উপনীত হইয়াছি তাহা তোমাকে বলিব এবং আমার স্তরে তোমারি হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিয়া দিব—একত্রে দুইজনে সেই পরম সুহৃদের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইব। অভিন্ন হৃদয় যে কত অমৃতময় মধুময় তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। দুই হৃদয় হইতে সুরভি প্রীতিসমীর একত্র হইয়া যখন ঈশ্বরকে গন্ধদান করে তখন তাহা এক হইয়া যায়। হে প্রিয়! আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, তুমি এখানে আসিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর এবং তোমার মুখচন্দ্রমার নির্ম্মল চন্দ্রিকা বিকীর্ণ করিয়া আমার গৃহ আলোকময় কর। মনে করি তোমাকে পাইলে আর কখন ছাড়িয়া দিব না, তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হউক এই আমার একমাত্র প্রবোধ। কহিতে কহিতে বাক্য যদি আড়ষ্ট হয় তথাপি মনে মনে তোমার গুণ গাহিতে থাকিব। আমি ব ইহকালের সুহৃদ এবং পরকালের অগ্রজ বলিয়া আমি তোমাকে জানিয়াছি।

সমাপ্তোয়ং বক্তৃতা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

জ্যায়ানের প্রতি কনীয়ান ভ্রাতার উক্তি

ভ্রাতঃ! আপনার স্নেহবিগলিত প্রীতির ছায়ায় এতদিন অধিবাস করিতেছি; দুঃখের কথা কাহাকে বলে আমি তাহা জানি না। আমাদের ভ্রাতৃভাবের মধ্যে তাপ কখন স্থান পায় নাই। বাল্যকাল অবধি যেমন একত্রে আহার একত্রে ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছি, তেমনি প্রীতির একশেষ আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এতদিন আপনার অমায়িক উদার স্নেহসলিলে নিমগ্ন থাকিয়া আপনার গুরুভার উপলব্ধি করিতে পারি নাই—এক্ষণে আমাদের প্রীতি গভীর পবিত্রভাব ধারণ করিতেছে, জানিতেছি যে পিতার ন্যায় আপনি আমার পূজনীয়। আমি যেমন আপনার স্নেহের ধন তেমনি আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার বিনীত সেবক। দেখিয়াছি যখনি কথাতে কার্য্যেতে আমার কোন ত্রুটি দেখিয়াছেন অমনি আপনি মধুমান উপদেশ দিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং পাছে আমার পরিশ্রম হয় এই ভয়ে কন্ধরে হস্ত বেষ্টন করিয়া আস্তে আস্তে আমাকে সত্যের পথে আনিয়াছেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিল হইলে যে কত সুখ তাহা হৃদয়েই রহিল. যেন স্বর্গ হইতে দেবপ্রীতি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের উভয়কে বাঁধিয়াছে। আপনার স্নেহের প্রতি কণা পর্ব্বত সমান কৃতজ্ঞতা দিয়া পরিশোধ করিলেও মনের পরিতৃপ্তি হয় না। হিমগিরির গুহায় যেমন ক্ষুদ্র বিহঙ্গম-

দল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করে, আমি তেমনি আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আপনার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া যেমন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি তেমনি সংসারের কর্ত্তব্যসকল আপনার নিকটে শিক্ষা করিতেছি। একদিন আপনি গৃহে না থাকিলে দিশাহারা হই এবং আপনার মুখচন্দ্র পুনর্ব্বার আমার নয়নে আলোককিরণ বর্ষণ করিলে আমি সকল ভার হইতে মুক্ত হই। বাল্যকালের এক এক দিনের কথা মনে হইলে মন প্রীতিতে বিগলিত হয়! উভয়ে যখন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতাম তখন কত যত্নে আমার কঠিন পাঠগুলি আমাকে বুঝাইয়া দিয়া তবে আপনার পুস্তক দেখিতেন। যাহা কিছু ভাল লাগিত তাহাই "এস মজা করে খাই" এই বলিয়া আমার সহিত বিভাগ করিয়া ভোজন করিতেন; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোন আমোদ সম্ভোগ করিতেন না। পিতামাতা আমাদের ভাব দেখিয়া না জানি কতই পরিতৃপ্ত হন। আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পিতামাতার সেবায় আমি আপনার সহচর হইব, যাহা কিছু কর্ত্তব্য আপনি তাহা আদেশ করিলে আমি প্রাণ দিয়াও তাহা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিব।

সমাপ্তোয়ং সৌভ্রাত্রো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

আলোক ও দৃষ্টি
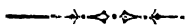
বিশ্বরচনার মধ্যে যে সমস্ত কৌশল বিশ্বপতির অসীমজ্ঞান ও মহীয়সী শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করে, আলোক রচনা তন্মধ্যে এক প্রধান কৌশল। আলোকসংক্রান্ত যে সকল অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আলোকের স্বরূপ, চক্ষের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, তাহার গতি ও বেগ—ইহার প্রত্যেক বিষয় পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন।

আমরা যখন সায়ংকালে দিব্য হীরকখচিত গগনমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত করি তখন আমাদের দৃষ্টিপথ যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা মনে ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে অর্দ্ধ হস্ত স্থান ব্যবহিত কোন বস্তু দর্শন করিলে আমাদের নেত্রক্ষেত্রে যে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই অচিন্ত্য-দূরবস্থিত বস্তুসমুদয়কে দৃষ্টি করিবার সময় সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চক্ষুপুত্তলিকার অন্তর্ভাগ একটি বহুকম্পসংযুত ধমনীময় ত্বক দ্বারা আবৃত। মস্তিষ্কনিঃসৃত ধমনীসমুদয়ের সহিত তাহার সংস্রব রহিয়াছে। কোন বস্তুর প্রতিরূপ নেত্রক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইলে সেই ত্বকের স্পন্দনক্রিয়া দ্বারা আমাদের দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু লক্ষ যোজন দূর হইতে আলোক অবতরণ করিয়া কি প্রকারে আমাদের দর্শন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে? এই প্রশ্নে কেবল দুই উত্তর প্রদান করা যায়।

প্রথমতঃ, এই বহুদূরস্থিত পদার্থ সমুদয় হইতে তদীয় পরমাণু সমুদয় বিনির্গত হয়, সেই সকল পরমাণু আকাশপথ হইতে অবনত হয়, চক্ষুপুত্তলিকায় প্রবেশ করে এবং তদন্তর্গত ধমনী-গুলিকে বিচলিত করে। এই প্রকারে দৃষ্টিক্রিয়া সমুৎপাদন করে। ইহা প্রাচীন মত।

দ্বিতীয়তঃ, সেই দূরস্থিত দৃশ্যপদার্থ এবং দর্শনেন্দ্রিয় ব্যবহিত স্থানে জ্যোতির্ব্বাহক এক প্রকার স্থিতিস্থাপক অতিসূক্ষ্ম বায়ুর ন্যায় পদার্থ বা ব্যোম বিদ্যমান আছে; সেই ব্যোম ভূবায়ুর ন্যায় প্রবাহধর্ম্মশীল। ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা বায়ু যে প্রকারে স্পন্দিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে, সেই ব্যোমও আলোকময় পদাথ দ্বারা সেই প্রকারে স্পন্দিত হয়। সেই ব্যোমের প্রবাহ সমুদয় আকাশমার্গ হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে এবং বায়ুর স্পন্দনক্রিয়া দ্বারা শব্দ যে প্রকারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, এই ব্যোমের প্রবাহ-সহকারে আলোকও তদ্রূপ চক্ষুর চিত্রপত্রে পতিত হয় এবং তদন্তর্গত ধমনীসকলকে পরিচালিত করে।

নেত্রতত্ত্ব-পণ্ডিতগণের মধ্যে এই দুই বিভিন্ন প্রকার মত প্রচলিত আছে। ইহার প্রথম মত গ্রাহ্য হইলে দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন গন্ধদ্রব্য হইতে তদীয় সূক্ষ্ম পরমাণুসকল বিনির্গত হইয়া নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাহাতেই আমাদের আঘ্রাণসুখের উপলব্ধি হয়, তেমনি কোন দূরস্থিত দৃশ্য পদার্থ হইতে তদীয় আলোক-

পরমাণু নিঃসারিত হইয়া চক্ষুপুত্তলিকায় প্রবেশ ও তদন্তরস্থ ধমনীসকলকে কম্পান্বিত করে, তাহাতেই দৃষ্টিক্রিয়া সম্পান্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মত সিদ্ধান্ত হইলে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিশেষ ঐক্যতা দৃষ্ট হয়। এমন কি, তাহা হইলে আমাদের শ্রবণক্রিয়ার উৎপত্তি বিষয়ক যে সকল নিয়ম নির্ণীত হইয়াছে, তাহা দর্শন বিষয়েও অভ্রান্তরূপে নিযোজিত হইতে পারে।

আলোকের গতিবিষয়ে পণ্ডিতেরা উল্লিখিতরূপ দ্বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব মত রক্ষার জন্য দুই বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস অবলম্বন করেন। এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা সকল পদার্থ হইতে তদীয় আলোকপরমাণু নিঃসরণকে দৃষ্টি সমুৎপাদনের প্রতি একমাত্র কারণ জ্ঞান করেন। অন্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক প্রকার প্রবাহধর্ম্মশীল অতি সূক্ষ্ম বায়ুর ন্যায় পদার্থের বা ব্যোমের অবস্থান বিশ্বাস করেন।

মহাত্মা নিউটন, যিনি অনুমান কিম্বা কল্পনা অবলম্বন করিয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত না করিয়া কেবল পরীক্ষা ও যুক্তিপথে পদার্পণ করিয়া সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভে তৎপর ছিলেন, তিনিও আলোককে পরমাণুবিশিষ্ট জ্ঞান করিতেন। তাঁহার আনুকূল্য বশতঃ উক্ত মত অনেককাল পর্য্যন্ত অনেকানেক পণ্ডিতগণ সহসা খণ্ডন করিতে সাহস করেন নাই। হিউজেনস্ প্রভৃতি নব্যতর পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাসহকারে উহার প্রতিকূল মত সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ইদানীন্তন পণ্ডিতেরা আলোকসংক্রান্ত যে সমস্ত পরমাশ্চর্য্য বিষয় অতীব যত্ন ও অশেষ পরীক্ষাসহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন

এবং তদ্বিষয়ক নূতন নূতন নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হিউ-জেন্‌সের মতের প্রচার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে। এই দুই প্রসিদ্ধ মতের প্রভেদ এই যে, এক মত বিশ্বাস করিলে আলোকবিষয়ক সাধারণতত্ত্ব অবধারণ করা যায় যথার্থ বটে, কিন্তু তৎসংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন বিষয় দিন দিন উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার সকল বিষয়ে সেই মত প্রয়োগ করা যায় না, কিন্তু অপর মতানুসারে উহার প্রায় সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই জন্য এইক্ষণকার পণ্ডিতগণ এই শেষোক্ত মতাবলম্বী।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, বায়ুর স্পন্দনক্রিয়া দ্বারা যে প্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, সেই প্রকার সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্যোমের প্রবাহে আলোক উৎপন্ন হইয়া নেত্রক্ষেত্রে পতিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই প্রবাহ কীদৃশ বেগে আকাশপথে গমন করে? অচিন্ত্য দূরবস্থিত জ্যোতিগণ হইতে আলোক কত শীঘ্র অবতরণ করিয়া নেত্রক্ষেত্রে পতিত হয়? লক্ষযোজন দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও কি তৎক্ষণাৎ তাহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিম্বা ক্ষণকাল বিলম্বে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়? যদি তাহাই হয়, তবে আলোক কত সময়ে কতদূর গমন করে তাহাই বা কি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে জ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিবার জন্য কত লোকের কত যত্ন নিরর্থক হইয়াছে, কত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, কত সময় বৃথা ব্যয় হইয়াছে তথাপি সে রত্ন উপলব্ধ হয় নাই; কিন্তু

ঈশ্বরেচ্ছায় কোন্ সামান্য সূত্রে তাহা সহসা আবিষ্কৃত হইয়াছে! কত সময়ে কেবল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিষ্প্রয়োজনীয় অনর্থক বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে অলক্ষিতপূর্ব্ব বহুমূল্য রত্ন উপলব্ধ হইয়াছে। আমরা যাহা অতীব ব্যগ্র হইয়া অনুসন্ধান করি, তাহা হয়ত কোন কার্য্যের নহে, কিন্তু যাহা অবশেষে লাভ করি তাহা অমূল্য ও হিতসাধক। বিশ্বপতির বিশ্বরচনা মধ্যে যে এই প্রকারে কত বিষয়ে উন্নতি হইতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বিশ্বরাজ্য কেবল উন্নতিরই ব্যাপার! বিশ্বপতির কেবলই উন্নতিই অভিপ্রায়!

আলোকের বেগ ও গতি বিষয়ক নিয়ম সমুদয় যে প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন।

যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয় আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাদের গতিবিধি নিরূপণ করিতে ব্যগ্র হইলেন। তাহার এক এক চন্দ্র বৃহস্পতিকে যত সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহা রোঈমর নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা তাহার গ্রহণগণনা দ্বারা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম চিত্রক্ষেত্রে স সূর্য্য। ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ সমুদয় পৃথিবীর স্থান—এই কএক স্থানে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিতি করে। ব বৃহস্পতি সূর্য্যের কিরণ পাইয়া স্বকীয় ছায়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিতেছে। ট ঠ চিহ্নিত বৃত্তরেখা তাহার একটি চন্দ্রের কক্ষামণ্ডল। বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতে
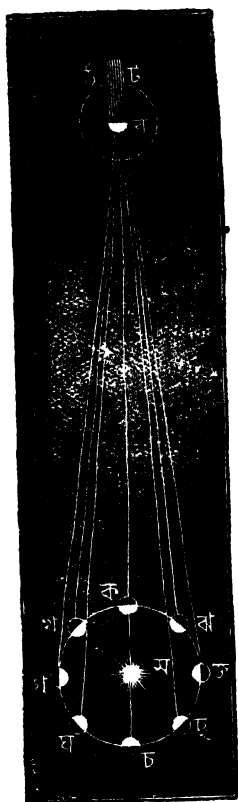
করিতে প্রতিবার তাহা ট চিহ্নিত স্থান হইতে ছায়াতে প্রবেশ করিয়া ঠ হইতে আবার বিনির্গত হইবে সন্দেহ নাই।

যে সময়ে উক্ত চন্দ্র একবার আবৃত্তির পর বৃহস্পতির ছায়াতে প্রবেশ করে কিম্বা যে সময়ে তাহা হইতে বহির্গত হয় তাহা সুচারুরূপে লক্ষিত হইলেই সেই চন্দ্রের বেগ একপ্রকার নিরূপণ করা যায়। সে সময় লক্ষ্য করাও কঠিন কর্ম্ম নহে। এই চন্দ্র যখন বৃহস্পতির ছায়াতে প্রবেশ করে তখন ইহা সূর্য্যরশ্মির অভাবে অন্ধকারে আবৃত ও অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ছায়া হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেই পুনর্ব্বার সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। রোমর ইহা মনে মনে স্থির করিয়া সেই চন্দ্রের বেগ নির্ণয় করিতেও প্রবৃ হইলেন; কিন্তু যাহাতে তাঁহার পরীক্ষা সুচারুরূপ সম্পন্ন হয় এই উদ্দেশে তিনি ধৈর্য্যপূর্ব্বক অনেক মাস অপেক্ষা করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

এক্ষণে মনে করা যাউক, যে, সেই চন্দ্রের উপর্য্যুপরি দুইবার

গ্রহণঘটনার মধ্যে ৪৩ ঘণ্টা সময় অতীত হইল। ইহা দেখিয়া অবশ্যই মনে হইতে পারে, বুঝি ইহার পরেও ৪৩ ঘণ্টা অন্তর গ্রহণ উপস্থিত হইবে।

পৃথিবী যখন স্বীয় কক্ষার ক চিহ্নিত স্থানে স্থিতি করে তখন তাহা বৃহস্পতি গ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। যখন পৃথিবী ছয় সপ্তাহ পরে খ চিহ্নিত স্থানে গমন করে তখন বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ ৪৩ ঘণ্টা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সময়ে সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হয়। যখন পৃথিবী ৩ মাসের পরে গ চিহ্নিত স্থানে আগমন করে তখন নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা বিংশতি পল বা ৮ মিনিট বিলম্বে সেই গ্রহণ সংঘটিত হয়। এই প্রকারে পৃথিবী ঘ চিহ্নিত স্থানে উপনীত হইলে ত্রিংশতি পল বা ১২ মিনিট ও চ চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত হইলে চত্বারিংশতি পল (১৬ মিনিট) অতীত হইলে সেই গ্রহণঘটনা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া রোঈমরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি মনে করিলেন বুঝি তাঁহার গণনায় কোন দোষ থাকিবে। কিন্তু তিনি ইহাও বিবেচনা করিলেন যে গণনায় দোষ থাকিলে সময়ের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হইত—তাহা হইলে গ্রহণঘটনা নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা কখনো বা শীঘ্র কখনো বা বিলম্বে উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন প্রতিবার বিলম্বই হইতেছে এবং গ্রহণঘটনার সময় প্রতিবার দশ পল (৪ মিনিট) করিয়া নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন গণনা দোষাশ্রিত হওয়া কখনই সম্ভব বোধ হয় না; ইহার কোন অবিদিত কারণ থাকিবে সন্দেহ নাই।

ইহা নিশ্চয় করিয়া রোঈমর এই বিষয়ের বিশেষরূপ পরীক্ষা

জন্য আরো ছয় মাস কাল ব্যয় করিতে নিযুক্ত রহিলেন। এই প্রকারে কাল তিরোহিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী সেই জ্যোতির্ব্বেত্তাকে সঙ্গে করিয়া ছ চিহ্নিত স্থানে আনয়ন করিলেন। এই সময় তিনি বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা কেবল ৩০ পল (১২ মিনিট) পরে গ্রহণ-ঘটনা উপস্থিত হইল। যখন মাসাষ্ট পরে পৃথিবী জ চিহ্নিত স্থানে আগমন করিলেন তখন ২০ পল (৮ মিনিট) মাত্র বিলম্ব হইল। এবং অবশেষে যখন পৃথিবী স্বীয় কক্ষাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার ক চিহ্নিত স্থানে উপনীত হইলেন তখন নির্দ্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ৪৩ ঘণ্টার আর কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হইল না।

এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া রোঈমর মনে মনে চিন্তা করিলেন পৃথিবী হইতে বৃহস্পতিগ্রহের দূরাদূরানুসারেই তদীয় চন্দ্রের গ্রহণঘটনার সময় বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। পৃথিবী বৃহস্পতিগ্রহ হইতে যত দূরে গমন করিতে থাকে, গ্রহণ-ঘটনার ততই বিলম্ব হইতে থাকে। যখন পৃথিবী ক স্থানে অবস্থিত ছিল তখন যত সময়ে বৃহস্পতির চন্দ্র বৃহস্পতিচ্ছায়া হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবেশ করিল, পৃথিবী চ স্থানে আগমন করিলে তদপেক্ষা ৪০ পল (১৬ মিনিট) কাল বিলম্ব হইতে দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর কক্ষামণ্ডলের ব্যাস ৯২০,০০০,০০ লক্ষ ক্রোশ। অতএব পৃথিবী স্বীয় কক্ষার ক চিহ্নিত স্থান হইতে চ চিহ্নিত স্থানে ৯২০,০০০,০০ ক্রোশ গমন করিলে ঐ গ্রহণঘটনার ৪০ পল বা ১৬ মিনিট বিলম্ব হয়। *

* বস্তুতঃ ১৬ মিনিটের কিছু বেশী ১৬ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড বিলম্ব হয়।

এই হেতু গণনাদ্বারা স্থির হইল যে পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলে গ্রহণঘটনায় এক সেকেণ্ড কাল বিলম্ব হয়।

রোঈমর এই সমস্ত বিষয় জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবেন? পৃথিবীর দূর-সামীপ্য অনুসারে যে বৃহস্পতির অধীনস্থ চন্দ্রগ্রহণের যথার্থই সময়বৈলক্ষণ্য হইয়াছে—এ অনুমান কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। পৃথিবীর গতির সহিত এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকা সম্ভব বোধ হয় না। আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তগমন করেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা সূর্য্যের গতি নহে। অতএব যাহা চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় তাহাতেই বিশ্বাস করিলে এ সমস্ত বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব লাভ করা যায় না।

অতএব এই গ্রহণঘটনার সময়বৈলক্ষণ্যের কারণ কি? রোঈমরের সহসা মনে হইল যে বৃহস্পতির চন্দ্র যে দণ্ডে বৃহস্পতিচ্ছায়ায় প্রবেশ করে তদ্দণ্ডেই আমরা সে বিষয় অবগত হইতে পারি না, কিছুকাল বিলম্বে উক্ত ঘটনা আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পায়। বৃহস্পতির চন্দ্রের ছায়াপ্রবেশ আমাদের তখন অনুভূত হয় যখন সেই চন্দ্র অদৃশ্য হইবার সময় তদীয় অবশিষ্ট আলোক তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া আমাদের নেত্রক্ষেত্র স্পর্শ করে। কিন্তু চন্দ্র যখন ছায়ায় প্রবেশ করে তখনই তাহার গ্রহণ হয় এবং তাহার অবশিষ্ট আলোক যখন ভূতলে অবতীর্ণ হয় তখনই সে গ্রহণ প্রত্যক্ষ হয়। অতএব পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে যতদূরে অবস্থিতি করে উক্ত দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কালের ততই বৃদ্ধি হয়।

এই প্রকারে আলোকের গতি ও বেগ নির্ণীত হইল। কোথায় বা বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণঘটনা এবং কোথায় বা আলোকের অত্যাশ্চর্য্য অচিন্তনীয় সত্বর বেগ! পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় লক্ষ ক্রোশ বৃদ্ধি হইলে তাহার চন্দ্রের গ্রহণঘটনা এক সেকেণ্ড কাল বিলম্ব হয়। অতএব আশ্চর্য্য দেখ, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০,০০০ ক্রোশ গমন করে।

এই পরমাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা রোঈমর আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। যাঁহারা আলোককে পরমাণুবিশিষ্ট বোধ করেন তাঁহাদের মতে সেই পরমাণুসকল প্রত্যেক সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ গমন করে। আর যাঁহারা আলোককে প্রবাহবিশিষ্ট জ্ঞান করেন তাঁহাদের মতে সেই আলোকপ্রবাহ ১০০,০০০ ক্রোশ করিয়া আকাশপথে সঞ্চরণ করে। জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে জলপ্রবাহ যে প্রকারে প্রবাহিত হইতে থাকে, আলোকপ্রবাহও সেই প্রকারে সঞ্চালিত হয়।

প্রবাহের বিষয় বিবেচনা করিবার সময় ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রবাহের প্রতীয়মান গতি বাস্তবিক জলের গতি নহে। অবায়ুবিচলিত পুষ্করিণীতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে যে প্রবাহমণ্ডল উৎপন্ন হয় তাহা বোধ হয় যেন সেই মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে ক্রমিকই দূরে গমন করিতেছে—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রবাহশীল জলে কোন লঘুবস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা কখন প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে না। এই প্রকার যদি একখান সুদীর্ঘ চাদর আন্দোলন করা যায় তবে তদুৎপন্ন প্রবাহ সমুদয় বোধ হয় যেন সঞ্চলিত হইতেছে, কিন্তু সে কেবল বোধ-মাত্র;

সেই প্রাবাহিক গতি বাস্তবিক গতি নহে; সেই প্রবাহ একবার ঊর্দ্ধদিকে একবার অধোদিকে দোলিত হইতে থাকে। তাহাতেই বোধ হয় যেন একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে। নদী ও সমুদ্রপ্রবাহেরও চলনক্রিয়া নাই। যে নৌকা নদীতে ভাসমান থাকে তাহা তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে না—কোন হংসকে প্রবাহশীল জলে সন্তরণ করিতে দেখিলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে যে তাহা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে না, প্রবাহ-ক্রিয়ায় তাহার শরীর দোলায়মান হইতে থাকে। যদি প্রবাহের দৃশ্যমান্ গতির সহিত জলের গতিক্রিয়া যথার্থই সম্পন্ন হইত; তবে কি হংস কি পোত সকল বস্তুই প্রবাহের সহগামী হইত, সন্দেহ নাই।

অতএব আলোকপ্রবাহের বিষয় বিবেচনা করিবার সময় সেই প্রবাহকে গতিশক্তিসম্পন্ন বোধ করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। কি জলপ্রবাহ, কি বায়ুপ্রবাহ কি, আলোকপ্রবাহ—সকল প্রকার প্রবাহেরই সমান ধর্ম্ম—কাহারও যথার্থ গমনক্রিয়া নাই।

আলোক প্রবাহের বিষয় ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ পায় নাই। এখনো যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আশ্চর্য্যের একশেষ বলিতে হইবে।

এই চিত্রক্ষেত্রে কুম্ভপৃষ্ঠাকৃতি একটি অত্যম্ন উদ্বক্র কাচের

উপরে একটি চতুষ্কোণ কাচ স্থাপিত হইয়াছে। চ চিহ্নিত স্থান উভয় কাচের সংস্পর্শ স্থান। এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে চ হইতে অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ যত অন্তর হইতে থাকে, ঐ কাচদ্বয়ের উভয় পৃষ্ঠ পরস্পর ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। ছ চিহ্নিত স্থানে তাহারা পরস্পর যত অন্তর, জ চিহ্নিত স্থানে আরও অন্তর এবং ঝ স্থানে তদপেক্ষা অধিক অন্তর।

এই দুই কাচ উক্ত প্রকারে সাজাইয়া তাহার উপর কোন বিশেষ বর্ণবিশিষ্ট জ্যোতি নিক্ষেপ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। যে স্থানে উভয় কাচ পরস্পরকে স্পর্শ করে সে স্থানে প্রথমে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখা যায়। এই বিন্দুর চতুর্দ্দিকে একটি রক্তবর্ণ জ্যোতিশ্চক্র দৃষ্ট হয়—এই জ্যোতি-শ্চক্রের চতুর্দ্দিকে আর একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রাবেষ্টন প্রত্যক্ষ হয়—তাহার চতুষ্পার্শ্বে আর একটি লোহিত জ্যোতিশ্চক্র এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ছায়ামণ্ডল উদয় হয়। এই প্রকারে একবার ছায়াচক্র একবার জ্যোতিশ্চক্র উপর্য্যুপরি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রত্যেক জ্যোতিশ্চক্র অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ হইতে যত দূরে স্থিতি করে তাহা পরিমাণ করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে।

এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় যে প্রথম জ্যোতিশ্চক্র হইতে অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ যতদূরে, দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চক্র হইতে তাহার দ্বিগুণ, তৃতীয় চক্র হইতে তাহার ত্রিগুণ এবং চতুর্থ জ্যোতিশ্চক্র হইতে তদপেক্ষা চতুর্গুণ দূরে অবস্থিতি করে ইত্যাদি। প্রথম জ্যোতিশ্চক্র এবং অধস্থিত কাচপৃষ্ঠের ব্যবহিত স্থান একটি প্রবাহের পরিসর। দ্বিতীয় চক্র হইতে উবক্র কাচের পৃষ্ঠ যতদূর তাহা দুইটি প্রবাহের আয়তন ইত্যাদি। প্রবাহক্রিয়ার

অবরোধ বশতঃ ছায়ামণ্ডলের উৎপত্তি হয়। উপরিস্থিত কাচের যে স্থানে প্রথম ছায়ামণ্ডল প্রত্যক্ষ হয় সে স্থান হইতে অধস্থিত কাচপৃষ্ঠের যত ব্যবধান তাহা একটী আলোকপ্রবাহের আয়তন হইতে অল্পতর—এই জন্য সে স্থানে প্রবাহক্রিয়ার অবরোধ হইল, সুতরাং তথায় ছায়া পড়িল। এই প্রকার প্রথম জ্যোতিশ্চক্র এবং দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয় কাচের যত দূরত্ব তাহা একটি প্রবাহের আয়তন হইতে অধিকতর কিন্তু দুইটি প্রবাহ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হওয়াতে প্রবাহক্রিয়ার পুনর্ব্বার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সুতরাং অন্ধকারের উৎপত্তি হইল। কিন্তু দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চক্রের স্থানে উভয় কাচের মধ্যস্থান দুই প্রবাহের সমান বলিয়া জ্যোতিশ্চক্র উদয় হইল। আবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যবর্ত্তী ছায়ামণ্ডলের স্থানে কাচদ্বয়ের ব্যবহিত স্থান দুইটি প্রবাহ হইতে বৃহত্তর কিন্তু তিনটি প্রবাহের সমান নহে, এই জন্য পুনর্ব্বার অন্ধকারের উৎপত্তি হইল। এই প্রকারে ক্রমাগত প্রবাহক্রিয়া একবার প্রতিরুদ্ধ একবার উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে আলোক প্রবাহের আয়তন স্থির করিতে হইলে, প্রথম জ্যোতিশ্চক্রস্থানে উভয় কাচের দূরতা নিরূপণ করিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

সকল বর্ণের জ্যোতিশ্চক্রের সমান ব্যাস নহে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকপ্রবাহের আয়তন বিভিন্ন প্রকার। লোহিত বর্ণের আলোকপ্রবাহের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তাহার পর নারঙ্গ বর্ণ—পরে পীত, হরিত, শ্যাম, নীল ইত্যাদি বর্ণের আলোকপ্রবাহ পর্য্যায়ক্রমে বিপুলতর হইয়া আইসে।

লোহিত বর্ণের আলোকপ্রবাহ এত সূক্ষ্ম যে তাহার ৫০০,০০ একত্র করিলে এক বুরুল স্থান মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারে। এবং ভায়োলেট বর্ণের ষষ্টিসহস্র প্রবাহ একত্র হইলে এক বুরুল স্থান পূর্ণ হয়। অন্যান্য বর্ণের আলোকপ্রবাহ উক্ত পরিমাণের মধ্যবর্ত্তী।

এই প্রকারে বর্ণের বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং শব্দ ও বর্ণের একপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য নিগূঢ় সম্বন্ধ নিরূপিত হইল। বায়ুপ্রবাহের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যেমন সঙ্গীতস্বরের তারতম্য হয়, আলোকপ্রবাহের অল্পাধিক বিস্তার হেতু তাহার বর্ণের তেমন তারতম্য হইয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহের উৎসেধ অনুসারে যেমন শব্দের উচ্চনীচত্ব অনুভূত হয় সেইরূপ আলোকপ্রবাহের উচ্চত্ব অনুসারে তাহার বর্ণ মলিন কিম্বা উজ্জ্বল দেখায়। শব্দমান পদার্থ দ্বারা বায়ুর স্পন্দনক্রিয়া উৎপন্ন হইলে সেই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণঢক্কা স্পন্দিত হয় বলিয়া যে প্রকার শব্দজ্ঞান হয়, সেই প্রকার দৃশ্যমান পদার্থ দ্বারা সূক্ষ্ম বায়ুবিশেষের প্রবাহ সঞ্চার হইলে সেই প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে নেত্রান্তর্গত ধমনী সমুদয় বিচলিত হয় বলিয়া দৃষ্টিজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। . . . .

যখন আমরা কোন লোহিতোজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন উল্লিখিত নিয়মানুসারে সেই নক্ষত্র হইতে আলোক-প্রবাহ আকাশপথে প্রবাহিত হইয়া নেত্রক্ষেত্রে পতিত হয়— এই সকল প্রবাহ চক্ষুপুত্তলিকার ছিদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চিত্রপত্রে পতিত হয় এবং ইহার প্রত্যেক প্রবাহে সেই পত্র এক একবার স্পন্দিত হইতে থাকে। অতএব প্রত্যেক

সেকেণ্ডে নেত্রক্ষেত্রে যত প্রবাহ পতিত হয়, প্রত্যেক সেকেণ্ডে চিত্রপত্র ততবার কম্পিত হয়, সন্দেহ নাই

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, আলোক প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রায় ১০০,০০০ ক্রোশ গমন করে। এই হেতু প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রায় ১০০,০০০ ক্রোশ বিস্তৃত আলোকপুঞ্জ চক্ষুপুত্তলিকায় প্রবেশ করে। অতএব সেই আলোকপুঞ্জ যত প্রবাহ ধারণ করে, চিত্রপত্রও প্রতি সেকেণ্ডে ততবার কম্পিত হয়।

এক্ষণে লোহিত বর্ণবিশিষ্ট আলোকের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। লক্ষক্রোশ পরিমিত স্থান এবং ১২০,০০০,০০০,০০ বুরুলস্থান (১ বুরুল প্রায় ১ ইঞ্চি) প্রায় সমান—ইহার প্রত্যেক বুরুলে লোহিত আলোকের ৪০০০০ প্রবাহ অবস্থিতি করে, অতএব ঐ সমস্ত স্থানে ৪৮০,০০০০০০,০০০০০০ প্রবাহ নিবেশিত রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশব্যাপী আলোকপুঞ্জ চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করে, তখন সিদ্ধান্ত হইল যে ঘটিকার দুই টিক্ টিক্ শব্দের মধ্যে আমাদের চিত্রপত্র (Retina) ৪৮০,০০০০০০,০০০০০০ বার কম্পিত হয়।

এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকে আমাদের চক্ষের চিত্রপত্রের ভিন্ন ভিন্ন বার স্পন্দন হয়। কিন্তু এই অনবরত স্পন্দনক্রিয়ায় আমাদের অপূর্ব্ব দৃষ্টিযন্ত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ইহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। যখন আমরা নানাবর্ণবিভূষিত ইন্দ্রধনুর শোভা দর্শন করি তখন কে মনে করে যে তাহার এক এক বর্ণ দেখিবামাত্র সময় আমাদের নেত্র কোটি কোটি বার কম্পমান হইতেছে।

বর্ণ	প্রবাহের স্থূলত্ব		প্রত্যেক সেকেণ্ডে কত স্পন্দন
লোহিত	একবুরুলের দশলক্ষভাগের ২৫৬ভাগ	৩৯১৮০	৪৭৭০০০০০০
নারঙ্গ	........................২৫০ ভাগ	৪১৬১০	৫০৬০০০০০০
পীত	২২৭ ভাগ	৪৪০০০	৫৩৫০০০০০০
হরিত	.২১১ ভাগ	৪৭৪৬০	৫৭৭০০০০০০
শ্যাম	.১৯৬ ভাগ	৫১১১০	৬২২০০০০০০
নীল	........................১৮৫ ভাগ	৫৪০৭০	৬৫৪০০০০০০
ভায়লেট	.১৭৪ ভাগ	৫৭৪৯০	৬৯৯০০০০০০

প্রত্যেক বর্ণের আলোকময় প্রবাহের যত পরিমাণ, এক বুরুল স্থানে যত প্রবাহ থাকিতে পারে এবং প্রত্যেক সেকেণ্ডে নেত্রের যতবার স্পন্দন হয়, তাহা অবিকল প্রদর্শিত হইল।

আমরা আলোক বিষয়ক দুই মতের যে মত গ্রহণ করি, তাহাকে পরমাণু বিশিষ্টই বোধ করি আর প্রবাহবিশিষ্টই জ্ঞান করি, এ উভয় মতেই আলোকে অসামান্য কৌশল প্রকাশ দেখিতে পাই। যদ্যপি প্রাচীন মতানুসারে ইহা বোধ করা যায় যে আকর্ষণ বিযোজন প্রভৃতি জড়পদার্থের গুণসম্পন্ন আলোকের পরমাণু সমুদয় আকাশপথে সঞ্চরণ করে, তাহা হইলে তাহাঁর অত্যাশ্চর্য্য অচিন্তনীয় সূক্ষ্মতা বিবেচনা করিলে চমকিত হইতে হয়। যদি একরতি পরিমাণ কতকগুলি আলোক-পরমাণুকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে লক্ষ ক্রোশ গতিসম্পন্ন বোধ করা যায় তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে ক্রোশার্দ্ধ বেগসম্পন্ন ও প্রায় দুই মন পরিমিত কামানের গোলকের তুল্য তাহার শক্তি সমুদ্ভূত হয়। অতএব এই প্রকারে কোটি কোটি পরমাণু কাচ বিশেষে একত্র সংহত হইলে যখন তাহাতে দিগদর্শনের শলাকাও কিছুমাত্র চালিত হয় না, তখন সেই পরমাণু সকল যে কত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

যদি আলোকের অত্যদ্ভুত সত্বর বেগের বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ই আমাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হয়, তবে অগণনীয় উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলের দূরত্বের বিষয় কি প্রকারে অনুধাবন করিব। ঐ সমস্ত লোকমণ্ডল সৌরজগতে স্বকীয় আকর্ষণ শক্তি পরিচালন করিলে গ্রহ উপগ্রহগণের গতিক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা হইয়া প্রভৃত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা দেখিয়া পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর তাহাদিগকে এত দূরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যে নিকটস্থ স্থির নক্ষত্র হইতে তিন বৎসর পরে তদীয় আলোক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়। এই আলোক কত কত নক্ষত্র হইতে লক্ষ বৎসর এবং আরও কত কত নক্ষত্র হইতে কোটি বৎসরে ক্রমাগত ধাবমান হইয়া আমাদের নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

আলোকের সহিত দৃষ্টির আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। এমন কি, আলোকের অসদ্ভাবে দৃষ্টির ও দৃষ্টির অভাবে আলোকের সৃষ্টি প্রায় নিরর্থক হইত। আলোক যে সপ্তপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত রহিয়াছে তাহাও সুদৃষ্টি সম্পাদনের জন্য বিশেষ অনুকূল হইতেছে। যদি একই বর্ণের আলোক অধিককাল নেত্রক্ষেত্রে পতিত থাকে, তাহা হইলে নেত্রান্তর্গত ধমনী সমুদয় ক্লান্ত হইয়া যায়, এইজন্য পুত্তলী আপনা হইতেই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে অথবা চক্ষু আপনা হইতেই ব্যবহার নিমীলিত হয়।

যদি কোন শ্বেতবর্ণ কাগজের উপর লোহিত ওয়েফর (চাকতি) রক্ষা করিয়া এবং তাহার প্রতি দীর্ঘকাল স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এবং পরে তাহার পার্শ্বদেশের কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে সে স্থানে আর একটি নীল ওয়েফর দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উৎকট শব্দের পরক্ষণেই

যেমন মৃদু শব্দের অনুভব হয় না—কামানের শব্দের পরক্ষণেই যেমন ঘটিকার টিক টিক শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না, সেইরূপ অত্যুজ্জ্বল লোহিত আলোক দৃষ্টি করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই শ্বেতক্ষেত্রের অত্যল্প তেজ বিশিষ্ট লোহিত আলোক অনুভূত হয় না, সুতরাং অবশিষ্ট কতিপয় বর্ণের একত্রীভূত ঈষৎ নীল বর্ণই প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকারে নীল ওয়েফরের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া শ্বেতক্ষেত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে লোহিত ওয়েফর প্রত্যক্ষ হয় ও হরিত বর্ণের ওয়েফরের উপর অধিক কাল সমভাবে দৃষ্টিপাত করিলে পীত বর্ণের ওয়েফর দেখা যায়।

একজন পণ্ডিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি অস্তোন্মুখে সূর্য্যের প্রতি কতক সময় স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিলেন, যে, লোহিতবেষ্টিত পীত ও হরিতযুক্ত সূর্য্যপ্রতিরূপ তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। তিনি যেমন চক্ষু উন্মীলন করিয়া একটি শ্বেত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিবেন তেমনি নীলবেষ্টিত এবং লোহিত ও কপিশযুক্ত সূর্য্যের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন। পুনর্ব্বার চক্ষু নিমীলন করিবামাত্র লোহিতবেষ্টিত হরিত সূর্য্য প্রতিভাত হইল। পরে আবার শ্বেতক্ষেত্রে নেত্রপাত করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই আকাশতুল্য নীলোজ্জ্বল প্রাবেষ্টণের সহিত লোহিতোজ্জ্বল সূর্য্য দর্শন করিলেন। পুনর্ব্বার নেত্র মুদ্রিত করিবার সময় সূর্য্য তাঁহার সমক্ষে শ্যাম বেশ ধারণ করিল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোহিত পরিখা দৃষ্ট হইল। এই প্রকার চারি পাঁচ মিনিট পরে সুন্দর নীলীয় রাগে রঞ্জিত ও উজ্জ্বল লোহিত বেষ্টনে প্রাবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার মানস পটে চিত্রিত হইল এবং তিনি উন্মীলিত চক্ষে পুনর্ব্বার শ্বেতক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে

সূর্য্যের প্রতিরূপ উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও তাহার চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

কৃতজ্ঞতা। *

আমাদিগের জীবনের এক দিন গত হইয়াছে এবং আমরা রজনীর সমাগম লাভ করিয়াছি। কিছুকাল পরেই আমরা সকলে গভীর নিদ্রাতে অভিভূত হইব; তখন নিদ্রান্বিত হইয়া বন্ধু বান্ধব জগৎ ও ঈশ্বর সমুদয়ই বিস্মৃত হইব। অতএব নিদ্রা আমাদের উপর যে পর্য্যন্ত রাজত্ব না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং উত্তমরূপে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখি, যে, ঈশ্বরপ্রেমে আমাদিগের মন কত অগ্রসর হইয়াছে। আমরা কি আমাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গণ্য করি? এবং যদি গণ্য করিয়া থাকি তাহা হইলে কি লোকের অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে প্রাণপণে যত্নবান হই? পরমেশ্বর যিনি পিতার পিতা মাতার মাতা ও গুরুর গুরু তাঁহার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কি ক্ষুদ্র সাংসারিক

* ১৭৮২ শক ১৮ ভাদ্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ সেনের বাটীতে রবিবার রাত্রিকালীন উপাসনার পরে প্রপঠিত।

বাধা অতিক্রম করিতে শক্ত হই? এই সকল গম্ভীর ও গুরুতর বাক্য নিদ্রার পূর্ব্বে মনে মনে আলোচনা করা উচিত। আমরা ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হইয়াছি অথবা তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াছি প্রতিদিনই যেন ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি। যদি দূরবর্ত্তী হইয়া থাকি তাহা হইলে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক আত্মাকে উন্নত করিবার চেষ্টা দেখিব এবং যদি অগ্রসর হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের আত্মপ্রসাদই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হইতে ক্রমাগতই আদেশ করিবে। আমরা যেন আত্মপ্রসাদ হইতে বিমুখ না হই, আমরা যেন আত্মপ্রসাদপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। বৃক্ষ যদিও মূল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে তথাপি আমরা মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি। ভ্রাতৃগণ! যিনি আমাদিগের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া সকলেরই আত্মারূপ মন্দিরে স্থিতি করিতেছেন সেই ঈশ্বর হইতে কেনইবা আমরা বৃথা বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা পাই, কেনইবা আমরা লজ্জা ভয় প্রযুক্ত ঈশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী হইতে শঙ্কিত হই। যিনি আমাদিগকে সুখে রাখিবেন বলিয়া বিচিত্র শক্তি সহকারে নানাপ্রকার সুখজনক দ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য হইল না কিন্তু তাঁহার সেই সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত হইল! হে পরমাত্মন! তুমি যে আমাদিগকে কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ কতপ্রকার আনন্দোপভোগের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ, তাহা আমরা কিপ্রকারে বর্ণনা করিব,—তাহা বাক্যেতে বলা যায় না, তবে আমি তাহা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব! তুমি

আমাদের চিরকালের সখা তথাপি আমরা তোমাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিই না;—আমাদের মত অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? যে পিতা আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন তাঁহাকেই পিতারূপে স্বীকার করিতে ও সমাজে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লোকলজ্জা লোকভয়ে ভীত হই, পরিবারের একটুকু কোপদৃষ্টির নিমিত্ত সেই পিতার পিতাকে পরিত্যাগ করি! হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর! আমি যেন লোকলজ্জা ও লোকভয়ে ভীত না হইয়া তোমাকে হৃদয়সন্নিধানে ধারণ করিয়া তোমাকেই মৃত্যুর সময় পাথেয় করি। আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সর্ব্বত্র প্রকাশমান দেখিতেছি;—তোমারই উজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা এই রাত্রি পরিপূরিত হইয়াছে, আমি তোমারই ভাব সর্ব্বত্র প্রকাশ দেখিতেছি। যখন তোমার প্রসন্ন মুখ আমার উপরে বিকীর্ণ রহিয়াছে তখন সাংসারিক বিপদ্ রাশিও আমার মনকে নত করিতে পারে না। আমার মনের ভাব এখন এই প্রকার যেন তোমার নিমিত্তে ধন প্রাণ মান সমুদায়ই বিসর্জ্জন দিতে পারি। হে জগদীশ্বর! যেন আমার মন এই ভাব সকল সময়েই ধারণ করে এবং লোকনিন্দা লোকভয় সকল পদতলে স্থাপন করিয়া তোমার উপাসনাতে ও তোমার কার্য্যে দৃঢ়ানুরাগ স্থাপিত করে। যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম, তখন কি তোমার ইচ্ছার বিপরীতে আমরা লোককার্য্য সমাধান করিব? কখনই নহে। হে অমৃতলোকনিবাসী অমৃতের পুত্রসকল! আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর যে, যদিও সূর্য্য চন্দ্রের বিনাশ দশা উপস্থিত হয়, যদিও নক্ষত্র তারা গ্রহমণ্ডলী সকলেই নির্ব্বাণ দশা প্রাপ্ত

হয়, তথাপি আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা করুণানিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে নিরস্ত হইব না, তথাপি তাঁহার মহিমা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে বিরত থাকিব না ও তাঁহার কার্য্যে লোকভয়ে ভীত হইব না এবং সকল সময়েই নির্জনে ও সজনে প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া তাঁহারই মহিমাকে মহীয়ান করিব।

পাপী ও পুণ্যাত্মা। *

ঈশ্বরের প্রতি মনের ভাব যত নিস্তেজ হইবে, মনুষ্যের অনুরোধে ঈশ্বরের কার্য্য হইতে যে যত বিরত হইবে, ততই সে শক্তিহীন হইবে ততই সংসার তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে। তুমি যখন সেই চির-সুহৃদকে ভুলিয়া রহিলে তখন তোমার শান্তি কোথায়? মানিলাম তুমি দেখিতে অতীব সুন্দর, তোমার গৃহ ধনে পরিপূর্ণ; কিন্তু তাহাতেই বা কি, তুমি কি অনন্তস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছ? তুমি কি সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাংসারিক বিপদ সকল অতিক্রম করিয়াছ? তুমি কি তোমার সাংসারিক কার্য্যসমুদয় তাঁহাতেই অর্পণ করিয়াছ? না কেবল ধনমদে বিষয়মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়কেই বিস্মৃত হইয়াছ? যদি তোমার স্বভাব এইরূপ হইয়া থাকে, তবে

* ১৭৮২ শকে ২৫এ ভাদ্র রাত্রিকালীন উপাসনার পরে প্রপঠিত

তোমার সৌন্দর্য্যও অন্তবিশিষ্ট হইবে এবং তোমার শ্রীও বিনষ্ট হইবে। কি না একশত বৎসরের নিমিত্ত তুমি অনন্তকাল পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতেছ!

এ প্রকার কুমতি যেন আমাদিগের মনে কদাপি রাজত্ব না করে। এ প্রকার তপ্তলৌহে যেন কদাপি পদনিক্ষেপ না করি। বরং জীবন নষ্ট হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি ঈশ্বর হইতে আমরা কদাপি বিচ্ছিন্ন হইব না। ঈশ্বর আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন আমিও যেন ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। আমি কি মনুষ্যগণের অনুরোধে ঈশ্বরপরাঙ্মুখ হইব? যিনি আমাদিগের স্রষ্টা পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা, যিনি আমাদিগের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর, আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধিবল যাঁহার প্রসাদে জ্ঞানধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, যিনি আমাদিগের শরীর মন ও আত্মাকে নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন, এমন ঈশ্বরকে কি আমরা সংসারের নিমিত্ত ভুলিয়া যাইব? ঈশ্বরাদেশের বিপক্ষে আর কোন আদেশকে আদেশ বলিয়াই বোধ হয় না। কোথায় সেই অনন্ত অগম্য অপার, আর কোথায় এই অনিত্য সংসারের ক্ষুদ্রভাব। একের সহিত কি অপরের তুলনা হইতে পারে? যখন সেই ভয়ানক মৃত্যু আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে, তখন কোথায়বা পিতামাতা, কোথায়বা বন্ধুবান্ধব, কোথায়বা স্ত্রীপুত্র এবং কোথায়বা ধনমান; তাহারা সকলেই আমাদিগকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবে। কেবল পাপপুণ্যই আমাদিগের সহগামী হইবে।

আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পাপী ও যে ব্যক্তি ঈশ্বরের

পথকে অবহেলন করিয়া সমুদয় জীবন সাংসারিক পথেই বিচরণ করিয়াছে, মৃত্যুর সময় তাহার মন কি যন্ত্রণাই ভোগ করিবে। সে সময়—সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে সে কেমন শত্রু জ্ঞান করিবে—যাহারা তাহাকে ধর্ম্মের পথে ঈশ্বরের পথে পদ-নিঃক্ষেপ করিতে দেয় নাই, যাহারা এতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সাংসারিক মৃগতৃষ্ণিকায় পরিভ্রামিত করিয়া আশ্রয়দাতাকে যে স্মরণ করে এমন উপায় রাখে নাই। মৃত্যুকালে তাহার এই মনে হইবে যে, আমি কি মূর্খ! আমি সেই সাংসারিক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারেই এতদিন মুগ্ধ ছিলাম—আমি ছায়াকে সত্য জ্ঞান করিতাম ও সত্যকে ছায়া জ্ঞান করিতাম। এক্ষণে আমার কি দুর্দ্দশা! যাঁহার নিয়ম সকল আমি এত কাল পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া আসিতেছি, যাঁহার উপাসনায় আমি একবারও রত ছিলাম না, তাঁহার নিকটে গিয়া এখন কি প্রকারে দণ্ডায়মান হইব? কোথায় বা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিব? কি গিরিগুহা-ভ্যন্তরে, কি সমুদ্রের মধ্যস্থলে, কি হিমালয়ের শিখরদেশে, যেখানেই কেন পলায়ন করি না সেইখানেই তাঁহার উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক মূর্ত্তি। হায়! আমার কি হইবে, আমি কোথায় যাইব? মৃত্যু এখন আমাকে গ্রাস করিতেছে, আমি এ সময়ে কাহার নিকট আশ্রয় লই? যে পিতামাতা আমার নব ঈশ্বরানু-রাগকে মুকুলাবস্থাতেই খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল আমার চতুর্দ্দিকে বসিয়া হাহাকার মাত্র করিতেছেন; কিন্তু আমার শেষ উপায়ের কি চেষ্টা দেখিতেছেন? তাঁহারা কেহই তো আমার সঙ্গী হইলেন না! তখনই বা কেন আমাকে ঈশ্বরবিমুখ করিয়াছিলেন, এখনই বা কেন পরিত্যাগের চেষ্টা

পাইতেছেন?—এইরূপ নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া সে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিবে; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা যে ব্যক্তি তাঁহার চিরজীবন ব্রহ্মেতেই অর্পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মে ও তাঁহার প্রকাশ্য উপাসনায় মনুষ্যভয়ে ভীত হয়েন নাই, মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব আর এক প্রকার হইবে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও তিনি ভয়ানক বোধ করিবেন না। যখন তিনি দেখিবেন যে মৃত্যু তাঁহাকে সেই চিরসখার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছে, তাঁহার মন শান্তিজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইবে। তাঁহার মন মৃত্যুশয্যায় কখন বিকৃতিভাব ধারণ করিবেক না; তিনি আপন পরিবার বর্গকে প্রীতিবাক্যে সান্ত্বনা দিবেন। তিনি তাঁহার পিতাকে কহিবেন—"হে তাতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত কেন দুঃখিত হইতেছেন? আমার প্রতি কদাপি মৃত্যুর অধিকার নাই, আমি অমৃতের পুত্র। তাঁহারই আশ্রয়ে পৃথিবীতে দিন যাপন করিয়াছিলাম এবং সেই চিরপ্রেমাস্পদের সহিত সহবাস করিয়া যে অমৃতভোজী হইব, ইহারই নিমিত্ত লোভ মোহ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য সমুদয় দমনে রাখিয়াছিলাম। এবং যদিও আমার মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইয়াছিল তথাপি তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি এখন ভয়শূন্য হইয়াছি। অতএব হে তাত! হে মাত! তোমরা কেন আমার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ? মৃত্যু আমার বিপদ নহে, আমি বরং ঐশ্বর্য্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি। সাংসারিক ঐশ্বর্য্য দুঃখের সহিত জড়িত, কিন্তু আমি যে সম্পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিদেশ গমন করিতেছি, সে সম্পদ মিলিত হইলে কেবল যোগানন্দের উৎস প্রেমানন্দের উৎস

ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকিবে। আমি আপনা-দিগের আশ্রয় হইতে স্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে গমন করিতেছি। দুঃখের বিষয় দূরে থাক্ ইহা বরং আপনাদিগের সুখেরই বিষয়।” তিনি তাঁহার দুঃখিনী ভার্য্যার হস্তে নিজ শিশুসন্তান অর্পণ করিয়া তাহারা যাহাতে ঈশ্বর পথে অগ্রসর হয় তাহারই জন্য আদেশ করেন। এবং নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা পত্নীর দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে কহেন— “ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপর তোমার যে অটল বিশ্বাস ছিল তাহা যেন এখনও সেই প্রকারই থাকে। তাঁহার উপর যথার্থ বিশ্বাস থাকিলে মমবিয়োগজনিত দুঃখ সুখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তুমি ক্রমাগত ঈশ্বরসম্মুখীন হইতে পারিবে। তুমি আপনাকে অটল-ভাবে ঈশ্বরহস্তে সমর্পণ কর, তিনি স্বয়ং তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। এ সংসার কেবল এক অসার পদার্থ। এখানে আমাদের সুখই বল, বন্ধুত্বই বল, আর প্রীতিই বল, ইহারা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। রাত্রিকালে যেমন এক বৃক্ষে নানা প্রকার পক্ষী সকল আসিয়া আশ্রয় লয় এবং প্রভাতে যথেচ্ছা গমন করে, যেমন পান্থশালায় পথিকেরা শ্রমবিনোদনের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করে এবং পরিশ্রম দূর করিয়া যেমন গম্য-স্থানে গমন করে, লোকেরাও সেই প্রকার কিছুদিন এখানে থাকিয়া তৎপরে প্রস্থান করে। তাহারা অস্থায়ী পুষ্পের ন্যায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, কিছুকাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম লয় ও তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। তাহারা একাকী জন্মগ্রহণ করে একাকী মৃত হয় এবং একাকী স্বীয় পুণ্য অথবা দুষ্কৃতিফল ভোগ করে। বান্ধবেরা তাহাদিগের মৃত শরীর কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক বিমুখ হইয়া গমন করে, ধর্ম্মই কেবল তাহাদিগের অনুগামী হয়েন। অতএব তুমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিও না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হইলেও হইতে পারে বটে ও কুশল লাভ এবং শত্রুদিগকে জয় করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা পরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই উপদেশ যেন তোমার মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। আর তুমি যদি কোন সময়ে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হও তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁহা হইতে অধিক বল প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিবামাত্রই তোমার সহ্যশক্তি দ্বিগুণিত হইবে এবং তুমি অনায়াসে সংসারের কুটিল পথ অতিক্রম করিতে পারিবে।"

সেই পুণ্যাত্মা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহার পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ দেন—"হে পুত্র! আমি অন্যদেশে গমন করিতেছি; এখন যে তোমাকে প্রকৃত হিত উপদেশ দেয় এমন লোক তুমি অল্পই দেখিবে। তুমি ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া যৌবনকালে পদনিক্ষেপ করিয়াছ; এই সময়ে তোমার চতুর্দ্দিকে বিষাক্ত ফণিগণ শয়ন করিয়া আছে;—সাবধান যেন ইহাদিগের বাহ্যসৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদিগকে ক্রোড়ে আকর্ষণ না কর। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে তুমি এখন কত কত সাংসারিক কুটিল জালে বদ্ধ হইবে, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য আসিয়া তোমাকে এককালীন চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে। নানা অমিত্র তোমার পক্ষে মিত্র বোধ হইবে। সংসারের কত বিঘ্ন তোমার সম্মুখে আসিবে, কত লোক তোমাকে কুটিলপথে

প্রবৃত্ত করিবে, কত মিথ্যাবন্ধু তোমাকে প্রতারণা করিবে। কত প্রকার আকর্ষণ, কত প্রলোভনে তুমি পতিত হইবে। তোমার যে অরবিন্দের ন্যায় এমন কোমল হৃদয়, যাহা অন্যের অল্প দুঃখ দেখিলেই আর্দ্র হয়, যাহা লোকের নিকট হইতে অল্প কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অন্তর্বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়, যাহা এখন ঈশ্বরে এমন দৃঢ়ানুরক্ত, তাহাই পুনরায় সংসারে প্রবিষ্ট হইলে অসৎ সংসর্গে একেবারে লৌহময় হইয়া উঠিবে। কিন্তু হে পুত্র! তুমি যদি এই সকল বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহ, তবে তাহার কেবল এই মাত্র পন্থা :—কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসংসর্গে পদার্পণ কর। ব্রহ্মবিৎ প্রকৃত বন্ধুর বাক্য কদাপি অবহেলন করিবে না এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। আমি জানি যে তুমি সুপথে পদনিক্ষেপ করিলেই অনেক অনেক লোক তোমাকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা তোমার সম্মুখে প্রস্তর ও পর্ব্বত রাখিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান, তুমি ঐ ঐন্দ্রজালিক বিভীষিকা সকল দেখিয়া ভীত হইলেও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইও না। উহারা কেবল দেখিতেই বাধা মাত্র প্রকৃত বাধা নহে। উহাদিগকে একবার উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিলেই উহারা আপনা হইতেই অদৃশ্য হইবে। অতএব হে পুত্র! আমার এই শেষ বাক্য গ্রহণ কর—যাহারা ঈশ্বর বিষয়ক কর্ম্মে তোমাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক জালে বদ্ধ করিবার উপায় দেখিবে, তাহারা যদি তোমার অতি নিকট সম্পর্কীয়ও হয় তথাপি সকলের অনুরোধ অবহেলা করিয়া তুমি ঈশ্বরোপসনায় রত থাকিও। এবং যদি কোন অপরিচিতও ধার্ম্মিক ব্রহ্মবাদী আসিয়া তোমাকে যথার্থ উপদেশ দেন, তুমি

তাঁহাকে পরম মিত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট হইও। তাহা হইলেই তোমার যৌবনকাল স্বচ্ছন্দে শান্তিমার্গে গমন করিবে এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও তোমার মুখজ্যোতিঃ সূর্য্যকিরণকে অতিক্রম করিবে।—তুমি অনায়াসেই অসৎ হইতে সৎস্বরূপে গমন করিবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে গমন করিবে এবং মৃত্যুর পরেও মৃত্যু হইতে অমৃতস্বরূপে গমন করিবে।—ঈশ্বর তোমার নিকট তাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশ করিবেন এবং পাপীরা যাঁহার প্রীতি উপলব্ধি করিতে পারে না তিনি তাঁহার প্রসন্ন মুখ দ্বারা তোমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবেন। তোমার হস্তে পিতার ভার সমর্পিত হইল; অতএব তোমার সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার ভ্রাতৃগণও যেন তোমার পথের অনুগামী হয়, তাহাদিগের মন যেন ঈশ্বরে দৃঢ়ানুরক্ত হয়। আর আমি তোমাকে কত উপদেশ দিব। আমি এখন নিরস্ত হইলাম। কিন্তু তুমি তোমার যদি প্রকৃত হিতানুসন্ধান কর তাহা হইলে সাবধান যেন কদাপি আমার এই উপদেশের বহির্ভূত হইও না।"

পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আপনার মনের সরল ভাব সকল এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়া সকলের হিত চেষ্টা করেন। মৃত্যুকে তিনি কিছুমাত্র ভয় করেন না। বরং তিনি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে জয়ী হয়েন। তিনি পরমাত্মার ক্রোড়ে কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিবেন, ইহার নিমিত্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

ইহার মনের ভাবের সহিত পাপীর মনের ভাব কত ভিন্ন? পাপী ব্যক্তি মরণশয্যায় পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিমাত্র

ভীত হয়। তখন সে মনে করে, আমি যদি আর কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মপথে চলিয়া পুণ্যাত্মা হইতাম। কিন্তু এখন আমার গতি কি হইবে? পাপীব্যক্তি এইরূপ ভূয়োভূয় ক্রন্দন করিলেও মৃত্যু তাহার নিমিত্ত দয়া প্রকাশ করিবে না। বরং মৃত্যু সেই পাপীর সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করতঃ সময়ে সময়ে জীবনের আশা ভরসা দর্শাইয়া একেবারে আপনার জঠরাগ্নিতে তাহাকে ভস্মীভূত করে। সে ব্যক্তির দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। সে অধর্ম্মবশতঃ যে সকল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল, সে সকলই এই পৃথিবীতে রহিল, পাপই তাহার অনুগামী হইয়া পরলোকে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য চলিল।

নিশীথে। *

রজনী সমাগত, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; এক্ষণে এই লোকালয় আমাদিগের নিকট জনবিহীন অরণ্যের ন্যায় নিস্তব্ধ বোধ হইতেছে। বিহঙ্গের মধুরস্বর আর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না, কেবল পতঙ্গের ঝিঁ ঝিঁ রব যেন রাত্রিকে জাগ্রত রাখিয়াছে। নীলোজ্জ্বল নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রতারকাগণে মণ্ডিত হইয়া হীরক-

---

* ১১ ভাদ্র ১৭৮২ শক।

খচিত নীলবসনের শোভা ধারণ করিয়াছে। আকাশ এখনও চন্দ্রবিহীন। এ সময় রাত্রিকাল কেমন এক আশ্চর্য্যবেশ পরিধান করিয়াছে। ঊষাকাল ব্যতীত অন্য কোন সময় আর এমন মধুর ভাব ধারণ করে না। আর কিছু পরে চন্দ্রমা পরমেশ্বরের আদেশানুসারে লক্ষ লক্ষ সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় আহ্লাদজনন প্রফুল্ল রশ্মিজাল প্রসারিত করতঃ পৃথিবীর হিত-বিধানে নিযুক্ত থাকিবে ও পৃথিবীনিবাসী লোকদিগকে আহ্লাদ-সাগরে নিমজ্জিত করিবে।

এক্ষণে দিনচর জন্তু ও বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ হইয়াছে; নিশাচরেরা বহির্গত হইয়া আহারান্বেষণে উন্মুখ হইয়াছে। মনুষ্যেরা এ সময়ে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিবিধ প্রকারে শ্রমবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছে, স্ত্রীপুত্রপরিবারেরা মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতেছে: কেহ বা ব্রহ্মপরায়ণা সতীস্ত্রীকে ব্রহ্মোপদেশ দিতেছেন, কোথাও বা সকল পরিবারবর্গ একত্র হইয়া গম্ভীর ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কোথাও বা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দরসে আর্দ্র হইয়া একত্র পরমেশ্বরের নিকট আপন আপন মন উন্মুক্ত করি-তেছে। এই প্রশান্ত রজনীতে ঈশ্বরকে দেদীপ্যমান প্রকাশ দেখিয়া কাহার গাত্রযষ্টি না রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে? হে ভুবনেশ্বর! সাংসারিক দুঃখশোক হইতে আকৃষ্ট হইয়া আমা-দিগের মন তোমারই কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইতেছে, তোমারই মহিমা উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত করিতেছে। যিনি দিবসের সমুদয় অনতিক্রমণীয় বিপদরাশি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রতি

কৃতজ্ঞতা স্রোত প্রবাহিত করি; আমাদিগের হস্ত, যাহা ক্ষণকাল পরেই নিস্তেজ হইবে, তাহা তাঁহারই প্রতি উত্তোলন করি; আমাদিগের চক্ষু, যাহা শীঘ্রই নিমীলিত হইবে, সেই চক্ষুদ্বয়ের নিমীলন হইবার পূর্ব্বেই আমাদের সর্ব্বস্রষ্টা প্রিয়তমের প্রতি তাহা উন্মীলন করি। আমাদের জিহ্বা সমস্ত দিবস পরিশ্রম পূর্ব্বক এক্ষণে অসাড় হইয়া যাইবে, কিন্তু অসাড়তার পূর্ব্বেই জিহ্বাকে সেই হৃদয়সন্নিহিতের গুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে নিযুক্ত করি। মনদ্বার কেবল তাঁহারই প্রতি এক্ষণে উন্মুক্ত করি, শরীর মনপ্রাণ সমুদয়ই তাঁহার প্রতি সমর্পণ করি, তিনি এ সকলেরই হিতবিধান করিবেন; তিনি ভিন্ন আমাদের প্রকৃত হিতসাধনের আর অন্য কাহার ক্ষমতা?

আমরা এখানকার এই ক্ষুদ্র কীট হইয়া তোমার অনন্ত মহিমা যে গান করি এমন আমাদের কি সাধ্য? কিন্তু তোমার গুণের যে কিছু অংশ আমাদিগের মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আমাদের মন তোমার গুণগান করিতে ব্যগ্র হইতেছে। এক্ষণে শয়নকাল উপস্থিত, এই সময়েই তোমাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিবার সময়, এই সময়েই আমাদিগের প্রিয় সুহৃদের নাম উচ্চারণ করিয়া লই। কে বলিতে পারে যদি এই শয্যাই আমাদের মৃত্যু-শয্যা হয়, যদি এই তমোনিদ্রা হইতে আমাদিগকে আর উঠিতে না হয়। সময় তড়িৎবৎ ঝটিতি পলায়ন করিতেছে; এক্ষণেই সেই সর্ব্বস্রষ্টাকে মনের সহিত স্মরণ করি, যিনি আমাদিগের ভেলক হইয়া এই সংসারার্ণবের ভয়াবহ উত্তুঙ্গ তরঙ্গবাজি হইতে উত্তীর্ণ করিয়া সংসার পার সেই ব্রহ্মপদে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন।

ভক্তের শেষ কথা।

সুহৃদ্গণ! আমি পরলোকে শীঘ্রই গমন করিব, আমার মনদ্বার এখন তোমাদিগের নিকট খুলিতে ইচ্ছা করি। এ সময়ে বোধ হয় রাত্রি দশটা হইবে, এখন এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে তাঁহারই সৌন্দর্য্য কেবল আমার মনে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। এই উদ্যান কি মনোহর! এই গঙ্গানদী কি আহ্লাদজনক! রাত্রি-কাল বশতঃ উদ্যানের বৃক্ষলতা সকল কেমন এক প্রকার গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। ঐ বড় বড় বৃক্ষ সকল ঝোঁপের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং উহাদিগের মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকাগণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে; ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষ সকল চন্দ্রকিরণ দ্বারা উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিতেছে। ঝাউ বট্ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল বায়ুদ্বারা হেলিত হইয়া ঝর ঝর শব্দ বিস্তার করিতেছে; এবং এই ভূমিশায়ী শুষ্ক পত্রোপরি মনুষ্যপদ সঞ্চার হইলেই কেমন সুমধুর মর মর ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে। আমার দক্ষিণ হস্তে গঙ্গানদী,— ইহার উপর চন্দ্রমার শোভা কেমন মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। সুধাংশু যেন এই পাটলবর্ণ কর্দ্দমাক্ত তরঙ্গরাজিতে সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। পরপারে গৃহাভ্যন্তর হইতে দুটি একটী প্রদীপের আলোক যেন লোহিত তারকাগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং অট্টালিকা সকল বৃক্ষের অন্তরালে অল্প অল্প লুক্কায়িত হইয়া কেমন মনোহরদৃশ্য হইয়াছে। নৌকোপরি নাবি-

কেরা অগ্নিসহকারে রন্ধন করিতেছে, তাহাতে সেই অগ্নির প্রভা জলেতে কি এক অদ্ভুত প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছে! নৌকাগুলি পালোত্তোলন করিয়া হংসের ন্যায় কেমন দ্রুত সন্তরণ করিতেছে। আহা! পোতোপরি কোন্ এক ব্যক্তি বংশীধ্বনি করিয়া আমার কর্ণকুহরকে একেবারে শীতল করিতেছে এবং উহাদের সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়াও আমার মন পুলকে আর্দ্র হইতেছে। দাঁড়ীদিগের দাঁড়ের ঝপাশ ঝপাশ শব্দ আমার অন্তরে সুধা বর্ষণ করিতেছে। এই গঙ্গানদীতে কল্ কল্ শব্দবিশিষ্ট তরঙ্গোপরি তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া দুগ্ধফেনার ন্যায় জলবুদ্বুদে আচ্ছন্ন হওত তীরে লাগিয়া টল্ টল্ শব্দ বিস্তার করিতেছে এবং যেন সূর্য্যবিরহে কাতর হইয়া ব্যলীক নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের অঙ্গ সকল মন্দ মন্দ জলকণা বিশিষ্ট বায়ু দ্বারা সিক্ত করিতেছে। হে বন্ধুগণ! চন্দ্রের দুর্দ্দশার প্রতি একবার চক্ষুরুন্মীলন কর, এইমাত্র ইহা অলঙ্কারোন্মত্ত হইয়া রত্নসিংহাসনে আসীন ছিল, কোথা হইতে এক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া ইহাকে গ্রাস করিতেছে; ধরা অন্ধকারাক্রান্ত হইল, দিক্ সমূহ সূচীভেদ্য তিমিরাবৃত হইল। গঙ্গানদী কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, এখন এই পৃথিবী কেমন এক মহৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে!—এতক্ষণ আমরা সৃষ্টবস্তুর রমণীয়তা দর্শন করিতেছিলাম এখন আমরা ইহাদিগের গম্ভীরতা দৃষ্টি করিতেছি; ইহাদ্বারা পরমেশ্বরের গম্ভীর মহৎভাব আমাদিগের মনে প্রকাশ পাইতেছে। আহা কি চমৎকার! চন্দ্রমা আসুরিক মেঘাবলী অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় পবিত্র বেশ ধারণ করত তিমিরাবৃত জগৎকে আহ্লাদিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। চন্দ্রের এইরূপ ব্যাপার যেন আমা-

দিগকে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিল, যে, যদিও কুপ্রবৃত্তি সকল বলপূর্ব্বক আমাদিগের পবিত্র আত্মাকে সময়ে সময়ে গ্রাস করে বটে ও আমাদিগকে আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ করে বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্পক্ষণেরই নিমিত্ত, কারণ, অপবিত্র আত্মা ভিন্ন পবিত্র আত্মা তাহাদিগের উদরে কখনই জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা তোমাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল যথাসাধ্য দমনে রাখিতে যত্নবান থাকিও এবং সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া স্বীয় মনকে ঈশ্বররূপ অর্ণবপোতে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিও, তবেই সমুদয় আধ্যাত্মিক অসুর তোমাদিগের নিকট পরাস্ত হইবে। আমার কি সাধ্য যে তোমাদিগকে উপদেশ দিই, কিন্তু তথাপি তোমাদিগের প্রতি আমার যে প্রেমানুরাগ বদ্ধ আছে তাহাই আমাকে এই বক্তৃতা বাক্য স্মরণ করিয়া দিতে বাধ্য করিতেছে। বন্ধুগণ! তোমাদিগের নিকট আমার এই শেষ কথা সমাপ্ত হইল, আমি এখন এই ভিক্ষা চাই যেন তোমরা ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া সাংসারিক মোহে মুগ্ধ না হও। ইহলোকে আমার সহিত এই শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু তোমরা যদ্যপি সৎপথে ও ঈশ্বরোপাসনায় চির জীবন যাপন করিতে পার, তবে হয়তো আমরা সকল ভ্রাতাই ঈশ্বরক্রোড়ে উপবেশন করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার মহিমা-গুণ গান করিব এবং ভ্রাতৃসৌহার্দরসে মিলিত হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিব, তাঁহারই উপদেশ গ্রহণ করিব এবং তাঁহারই নিকট আমাদিগের প্রার্থনা প্রেরণ করিব। আহা কি সুখের বিষয়, আমরা যাহারা ইহলোকেও সময়ানুযায়িক কোন গৃহে একত্র মিলিত হইয়া দিনাবসানে তাঁহারই উপাসনায় মনোনিবেশ করিতাম, পরলোকেও হয়তো সেই সকল ব্রহ্মবিদ্

বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া পিতার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিব। এই সকল ভাব উদয় হইয়া আমার মন সংসারের অচিরস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুরভাব হইতে উচ্চে উত্থিত হইয়া সেই পরাৎপর সারাৎসারেরই প্রতি ধাবিত হইতেছে এবং আমার মন যেন পুলকে আর্দ্র হইতেছে। আমি মৃত্যুকে বন্ধু জ্ঞান করিতেছি, যে মৃত্যু ক্ষণকালের পর আমাকে অমৃতের নিকট লইয়া যাইবে। আহা আমি কি দেখিতেছি! সকলেতেই যে তাঁহারই আবির্ভাব দেখিতেছি, আমার আত্মাতেই সেই সত্যজ্যোতিকে স্পষ্ট দর্শন করিতেছি। আমার নিকট এ পৃথিবী এখন মধুর বেশ ধারণ করিয়াছে, গঙ্গাস্রোত মধু বহন করিতেছে ও আকাশের চন্দ্র তারকাগণ আমার গাত্রে মধু সিঞ্চন করিতেছে; আমার মন শান্তিসলিলে অবগাহিত রহিয়াছে। আমি এখন নানা প্রকার স্বর্গীয় সুখের কল্পনা করিতেছি; আমি মৃত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই তাঁহার সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইয়া অনবরত ভক্তিপুষ্প ও প্রীতিপুষ্প তাঁহার পাদপদ্মে উপহার প্রদান করিব। আমার মন যেন এক্ষণেই শরীর ভেদ করিয়া সেই সেই লোকে যাইবার চেষ্টা পাইতেছে। আহা পরমেশ্বরের কি করুণা! তাঁহার অগণ্য সন্তানের মধ্যে আমি এক অতি ক্ষুদ্র সন্তান তথাপি তিনি আমাকে বিস্মৃত হয়েন নাই; কিন্তু আমরা কি অধম, আমরা সংসার আমোদেই ব্যস্ত থাকিয়া আমাদিগের সেই প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া থাকি। যাঁহার হস্ত দ্বারা লালিত পালিত হইতেছি, যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র সপ্তাহ পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর সুখে কালক্ষেপ করিতেছি, যাঁহার কৃপায় ব্রহ্মনাম উপভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি এবং যিনি আমা-

দিগের সেই ব্রহ্মানন্দকে অচিরস্থায়ী না করিয়া একেবারে অনন্ত কালের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন, এমন যে আমাদের সেই কৃপাবান পিতা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেই যৎপরোনাস্তি যত্নবান হই; কিন্তু কি করি, আমরা সকলে পরিমিত, আমাদের জ্ঞান পরিমিত, আমাদের শক্তি পরিমিত, আমাদের ধর্ম্ম পরিমিত, অতএব সেই অপরিমিত পরমাত্মাই আমাদিগকে যথার্থ শান্তি প্রদান করিয়া তাঁহারই পথে অগ্রসর করিবেন। আহা! আমি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কবে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইব। এ সংসারে চির-কাল বদ্ধ থাকা কেবল অধম মনেরই ইচ্ছা, এখানে মনের সুখ কিছুমাত্র হইবার উপায় নাই। যে সকল সন্তানতুল্য লোকদিগকে মনে করা যায়, যে, ইহারা আমার বৃদ্ধাবস্থাতে অবলম্বনস্বরূপ হইবে, তাহারাই হয়তো সর্ব্বপ্রথমেই পিতৃতুল্য লোকদিগের প্রতি খড়্গা হস্ত হইয়া উঠে; যে সকল ব্যক্তিদিগকে বাল্যাবস্থা অবধি বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির আশা করি, তাহারাই কৃতঘ্ন হইয়া আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে, তাহারাই আমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইবার উপায় দেখে, তাহারাই সর্ব্বসমক্ষে আমায় অমান্য করিতে অগ্রসর হয়। যে সকল বন্ধুর নিকটে আমার মন উন্মুক্ত করি, তাহারাই হয়তো সেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া আমাকে দুর্বিপাকে পাতিত করে; যে সকল গুরুতুল্য ব্যক্তিদিগের প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর, তাঁহারাই হয়তো আমাকে ঈশ্বর হইতে এককালীন বিচ্ছিন্ন হইতে আদেশ করেন এবং সংসারই যেন আমার সর্ব্বস্ব এই হেতু সংসারেই একেবারে মুগ্ধ হইতে

আজ্ঞা করেন। অতএব ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে এ পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ লাভ করা অতি সুকঠিন; সুখ দুঃখ এখানে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতেছে—কখনও বা সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিতেছে এবং কখনওবা দুঃখ সুখকে অতিক্রম করিতেছে। অতএব এই প্রকার পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে আত্মঘাতী নাস্তিক ব্যতীত আর কাহার চিরকাল বাস করিতে ইচ্ছা হয়? আমার আত্মা দেহরূপ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া এখন অনন্তলোকে পর্য্যটন করিবে। আমার আত্মা ব্রহ্মানন্দের স্রোতে অবগাহন করিয়া শীতল হইবে। এখন সর্ব্বস্রষ্টার পাদপদ্মকে আমার হৃদয় হইতে মুহূর্ত্ত কালও উত্তোলন করিব না। এক্ষণে আমার ধন মান যশঃ সুখ সৌভাগ্য কেবল তিনি মাত্র বর্ত্তমান। আমার পরম পিতা আমাকে সহস্র দণ্ড বিধানই করুন বা নাই করুন আমি তাঁহাকে পিতা সম্বোধন করতঃ তাঁহার ক্রোড়ে যাইতে কখনই বিরত হইব না এবং ইহাও আমার নিশ্চয় প্রতীতি যে, তাঁহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেই তিনি আমাকে আদর পূর্ব্বক ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন এবং আমাকে তাঁহার শীতল আশ্রয় প্রদান করিবেন। তিনি ভিন্ন আর কাহার নিকট হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিব? অন্য যাহার নিকট গমন করিব তাহারা হয়তো কেবল শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতেই উদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু আত্মগ্লানি ও পাপ হইতে যে মুক্ত করে, ইহা কাহার সাধ্য। আত্মার শান্তি তাঁহার নিকট ভিন্ন আর কোন স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে যে-বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান রহিলে সাংসারিক বিপদাপদ্ লোভ মোহ শোকতাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারি সেই বৃক্ষেরই আশ্রয় লইতে এখন সম্পূর্ণরূপে

ব্যগ্র হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! এ সংসার কেবল এক অসার পদার্থ, এখানে আমাদিগের সুখ কখনই চিরস্থায়ী নহে। মৃত্যু এক-কালে না এককালে আমাদিগের প্রত্যেককেই অবশ্য গ্রাস করিবেক। ইহার ভয়ে আমরা যে কোন স্থলে পলায়ন করিব সেইখানেই মৃত্যু আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া আমাদিগকে বিষদন্তের আঘাত প্রদান করিবেক। মৃত্যু রাজবাটীর অট্টালি-কাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ইহা অন্তঃপুরের বিশ্রম্ভালাপেও বর্ত্তমান থাকে, ইহা দীন দুঃখীর পর্ণকুটীরেও বাসস্থান নির্ম্মাণ করে এবং ইহা বৃক্ষমূলাশ্রয়ী পথিকদিগেরও সম্মুখে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুহস্ত হইতে কোন প্রকারেই পলাইবার উপায় নাই। ইহা অবসর পাইলেই আসিয়া আক্রমণ করে। ইহার নিমিত্ত পতিপত্নীর এককালে বিচ্ছেদ দশা উপস্থিত হইবে, পিতা পুত্রের কোন না কোন সময়ে অন্যান্যের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে হইবে, বন্ধুতে বন্ধুতে একবার বিভক্ত হইতে হইবে। আমরা বাক্য কহিতে কহিতেই হয়তো কাহারও বাক্য স্থগিত হইতে পারে। অতএব বৃথা কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; যতক্ষণ আমরা একত্রে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দরসে মিলিত আছি ততক্ষণ সকলে ঐক্য হইয়া প্রীতিপুষ্প দ্বারা সেই চিরসুহৃদের অর্চনা করি—যিনি আমাদের চিরকালের উপজীব্য হইবেন এবং যাঁহার সহিত আমাদের কোন কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। হে গতিনাথ! তোমা হইতে আমাদের আর অন্য গতি নাই, তুমি আমাদিগের মনকে বিষয়জাল হইতে আকৃষ্ট করিয়া তোমার পাদপদ্মের শীতল ছায়া প্রদান কর ও তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতি আমাদিগের উপর

বিকীর্ণ কর—যাহা কেবল একমাত্র আমাদিগের মনকে সাংসারিক মোহ কোলাহল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। হে করুণারস-সাগর! যদি তুমি আমাদিগকে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বলিদান দিতে আজ্ঞা কর তাহাতেও আমরা স্বীকৃত আছি, কিন্তু যেন কৃপা বশতঃ এই অধীন সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

ঋগ্বেদ।

ঋগ্বেদ সংহিতার দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়: এক অষ্টকে বিভাগ, এক মণ্ডলে বিভাগ। অষ্টক বিভাগ হইতেছে—সমস্ত ঋগ্বেদ প্রায় সমান মাত্রায় আট ভাগে বিভক্ত, তারি এক একটা ভাগের নাম অষ্টক। প্রত্যেক অষ্টক আবার আট অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত চৌষট্টি অধ্যায় হইল। প্রত্যেক অধ্যায় কমবেশী তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত; সকল অধ্যায়ই যে ঠিক তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত তাহা নয়—সর্ব্বশুদ্ধ দু হাজার ছয় বর্গে বিভক্ত। সকল অধ্যায় তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত হইলে ২১১২ বর্গ হইত। প্রত্যেক বর্গে প্রায় পাঁচটী করিয়া ঋক আছে। এমতে ঋগ্বেদ অযুত ঋকের সমষ্টি।

দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ হইতেছে মণ্ডলে। এ অনুসারে দশ মণ্ডল, পঁচাশি অনুবাক, হাজার সাতের সূক্ত এবং দশ হাজার

পাঁচশ আশী ঋক। সূত্রপ্রণেতা ঋষিবংশ অনুসারে এই বিভাগ। প্রথম এবং দশম মণ্ডলের সূক্ত সকল নানা ঋষির রচিত। দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্ত গৃৎসমদ ঋষিবংশের। তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্রের, চতুর্থ বামদেবের, পঞ্চম অত্রির, ষষ্ঠ ভরদ্বাজের, সপ্তম বশিষ্ঠের, অষ্টম কণ্বের এবং নবম মণ্ডল অঙ্গিরা ঋষির রচিত। এই ঋষিদিগের নামে ঋষিবংশ বুঝিতে হইবে। প্রতি মণ্ডলে দেবতাপরম্পরায় সূক্ত সকল শ্রেণিবদ্ধ আছে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল সূক্ত তাহাই প্রথমে, তারপরে ইন্দ্র, তারপরে অন্য দেবতা। প্রথম আট মণ্ডলে এইরূপ। নবম মণ্ডলের সমস্ত সূক্ত সোমলতার উদ্দেশে। এই নবম মণ্ডলের সঙ্গে সামবেদের অত্যন্ত যোগ; ইহার তৃতীয় অংশ প্রায় সামবেদে তোলা। তেমনি দশম মণ্ডলের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

ঋগ্বেদের এইরূপ যে মণ্ডলে বিভাগ এ বিষয় প্রথম ঐতরেয় আরণ্যকে, এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়নের দুই গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যেতে দশ বিভাগের কথাই আছে এবং যাস্কমুনিও এই দশ বিভাগই স্বীকার করেন, এই জন্য ঋগ্বেদকে দশতয্য বলেন। কাত্যায়নের অনুক্রমণী কিন্তু অষ্টক এবং অধ্যায় বিভাগ অবলম্বন করে। এখন যে ঋকসংহিতা প্রচলিত, উহা শাকল বংশের শৈশিরীয় শাখা। ইহার আর এক শাখার কথা কখন কখন শোনা যায়, তাহা হইতেছে বাস্কল-সংহিতা; তাহাতে ইহাতে বড় প্রভেদ নাই। যাস্ক একজন শাকল্য ঋষির নাম করেন, তিনি ঋকসংহিতার পদপাঠের রচয়িতা; শুক্লযজুর শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ দেশের জনক রাজার সভায় শাকল্য বিদগ্ধ নামে পণ্ডিতের উল্লেখ আছে—

তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

প্রবাদ আছে শাকলদিগের সহিত শুনকদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ। এবং শৌনক ঋগ্বেদ রক্ষার্থে উহার ঋষি, ছন্দ, দেবতা, অনুবাক, সূক্ত পঞ্চবিধান এবং পঞ্চের পদচ্ছেদ করিয়া একটা অনুক্রমণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বৃহদ্দেবতার বিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে; ইহা ব্যতীত ঋকের প্রাতিশাখ্য এবং একটী স্মার্ত্তসূত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন, আর একটী কল্পসূত্রও প্রস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য আশ্বলায়নের কল্পসূত্র প্রস্তত হইলে পর, তিনি নিজের কল্পসূত্র বিনষ্ট করিলেন। এই সকল একজন শৌনকের দ্বারা হওয়া কিছু অসম্ভব নহে, অথবা শৌনক শ্রেণীর দ্বারা হইলেও হইতে পারে, কেন না ঋকসংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডল শৌনকের নামে কথিত। আবার এই শৌনককে সেই শৌনকের সঙ্গে এক করে, যে শৌনকের নৈমিষারণ্যয় যজ্ঞে বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি, বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রে যে মহাভারত ও হরিবংশের পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই দ্বিতীয় বার বর্ণন করিয়াছিলেন। অতএব ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের শৌনক এবং আশ্বলায়নের গুরু নৈমিষারণ্যের শৌনক যদিও একই ঋষিবংশের, তথাপি ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন শৌনকের নাম উল্লিখিত আছে—এক ইন্দ্রোত শৌনক, ইনি পরীক্ষিত জনমেজয়ের যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন, আর একজন স্বেদায়ন শৌনক, তিনি উদীচ্য, উত্তর প্রদেশে তাঁহার বাস।

পঞ্চাল বাভ্রব্য ঋকসংহিতার ক্রমপাঠ রচনা করেন। অতএব কুরুপাঞ্চাল ও কোশল বিদেহের লোকগণেরাই (শাকল্য কোশল

বিদেহ) ঋগ্বেদ তথা যজুর্ব্বেদের সংহিতা বদ্ধ করিবার বিষয়ে প্রধান। কথন ঐ দুই রাজ্যের বোধ হয় বিশেষ প্রাদুর্ভাব-সময়।

কিন্তু বেদের ঋক ধরিতে গেলে আমাদিগকে অনেক পূর্ব্বে যাইতে হয়। পূর্ব্বকার দেবদেবীর আখ্যান (ঠাকুরদিগের কথা) এবং ভূগোল দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

তখনকার দেবদেবীর বৃত্তান্ত—শিশুদিগের কল্পনার ন্যায় দেবদেবীর উপন্যাস পাওয়া যায়। গ্রীক ও পারস্য জাতির উপন্যাসের সঙ্গে এই সকলের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি কথার উল্লেখ করিতেছি:—যেমন, মনুষ্য মৃত হইলে তাহার আত্মা অনিলে পরিণত হয়, তাহাকে পক্ষবান পবন বিশ্বাসী কুকুরের ন্যায় যথাস্থানে লইয়া যায়। তবে স্বর্গের সমুদ্রস্বরূপ বরুণ জগৎকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্বর্গের পিতা দ্যৌস্পিতা পৃথ্বী মাতা।

আকাশের জল যেন উজ্জ্বল অপ্সরা, সূর্য্যের কিরণ যেন গাভী মাঠে চরিতেছে; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বৃত্রাসুর এই সকল অপ্সরা ও গরুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং মহাবল ইন্দ্র বিদ্যুৎ বজ্র চালনা দ্বারা বৃত্রাসুরকে হনন করিতেছেন।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর এক প্রমাণ এই, যে, দুই দেশের দুই মহাকাব্যের মূল ঋগ্বেদের মধ্যে পাওয়া যায়। উভয়ত্রই স্বভাবের আবির্ভাবের সামান্য রূপক বর্ণনাকে ইতিহাসের আকারে সাজাইয়াছে। পারসিদিগের বেদ অবেস্তা, তাহাতে এই দেবাসুরের মল্লযুদ্ধ অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্ত্যে নামান হইয়াছে—প্রকৃতিরাজ্য হইতে নীতি রাজ্যে আনীত হইয়াছে: এক জন

পুত্রৈষণা করিয়া ভক্তিভরে সোমযাগ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার এক বীর পুত্র জন্মে, সে জগতের পবিত্রতা হরণোদ্যত দুর্জ্জয় সর্প অসুরকে বিনাশ করে। ইহাকেই আবার পারস্য কবি ফরদূসী ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই যুদ্ধকে ইরাণদেশে ঘটাইয়াছেন। আবস্থে সেই সর্পের নাম হইতেছে 'আজিদহক'; বেদে 'আজি'কে 'অহি' বলে, 'দহক' এর বৈদিক হয়ত 'দাসক', আবস্থের 'আজিদহক' তবে বেদের 'অহিদাস' হইল। পারস্য মহাকাব্যে ইহাই আবার রূপান্তরিত হইল এইরূপ:—ইরাণের সিংহাসনে জোহাক নামে এক অত্যাচারী রাজা হইল, ফিরেদূন্ তাঁহাকে সংহার করিয়া পীড়িত লোক-দিগকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বাধীনতা ও সন্তোষ স্থাপন করিলেন। ফেরেদূন্ মহাকাব্যের,—ত্রৈতন্ বেদের; অবেস্তাতে আছে 'থ্রএতওনো', অতএব বেদের প্রকৃতির খেলা হইতে কাব্যে এবং পরে তাহা হইতে আবার ইতিহাসে পরিণত হইতে কোন্ না তিন চার হাজার বৎসর গিয়াছে। এইরূপ পারস্যের জেমষীদ বেদের যম ও অবেস্তের যিম; যথা পারসী কইকবূস্ বেদের কাব্য উষনস্, অবেস্তের কবউশ্; তেমনি পারসী কায়খোসরূ হয়ত বেদের সুশ্রবস্ অবেস্তের হুশ্রবংহ্। হিন্দুস্থানের প্রবাদ পারস্য গল্পের আর এক দিক মাত্র। এমন কি যজুর্ব্বেদের সময়েও ঋগ্বেদের সময়ের গল্পটা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ইন্দ্রকে ঝগ্ড়াটে হিংস্কুটে দেবতা করিয়া ফেলিয়াছে, যে কেবল প্রকাণ্ড অসুরকে নীচ ধূর্ত্তমি দ্বারা জয় করে। আবার কাব্যের মধ্যেও ইন্দ্রের হয় পূর্ব্বোক্ত ভাব রাখিয়াছে নয় ইন্দ্রকে মনুষ্যশূরে পরিণত করিয়াছে, যেমন অর্জ্জুন হইল ইন্দ্রের অবতার

যিনি অদ্ভুত [illegible] অসুরাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। এইরূপে মহাভারত রামায়ণের প্রধান প্রধান বড় সব ব্যক্তি কর্তৃত্বির রাজাদের মত জান করিয়া দেখিতে গেলেই অন্তর্ধান হয়। কেবল ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাটা থাকিয়া যায়, যাহার উপর পুরাকালের দেবতাদিগের গল্প উপন্যস্ত হইয়াছে। মনুষ্য বিশেষ সব পশ্চাৎসর হয়, তাহাতে কেবল কবির সৃষ্টি অদ্ভুত হয়। • •

তৃতীয়তঃ, ঋগ্বেদের গানেতেই সেই রচনাকালের সময় স্থান ও অবস্থা বিবৃত হয়। ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ঋক সমূহে আর্য্যদিগকে সিন্ধুনদীর দুই পারে দলে দলে পরস্পর বিরোধী ও বিবাদে রত হইয়া বাস করিতে দেখা যায়; সেখানে তাহারা পশ্বাদি চারণ পূর্ব্বক যাযাবর জীবন যাপন করিত, তাহারা পৃথক রূপে বা ক্ষুদ্র সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিত, আপনাদের মধ্যে সর্ব্বদা সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিত, যাগযজ্ঞ সকলে মিলিয়া মিশিয়া করিত। প্রতি পরিবারের পিতা আপনার বাড়ীর পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—অগ্নিকে স্বহস্তে জ্বালাইতেন, গৃহ্য অনুষ্ঠানবিধি আপনি সম্পন্ন করিতেন এবং দেবতাদিগের স্তোত্র আরাধনা করিতেন। বড় বড় সাধারণ যজ্ঞের সময়, সেটা যেন সমগ্রদলের উৎসব হইত, সেই যজ্ঞ, দলপতি রাজা করিতেন, তাহাতে বিশেষ বিশেষ পুরোহিত সকল নির্দ্দিষ্ট হইত,—যাহারা ঐ সকল ক্রিয়াতে বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিত। যজ্ঞের পৌরোহিত্য কার্য্য লইয়া ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব হইতে দেখা গিয়াছে—তাহার মধ্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বংশের শত্রুতা চির-প্রসিদ্ধ; বেদের সময় হইতে পুরাণের সময় পর্য্যন্ত সে শত্রুতা

বরাবর চলিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছু নয় কেবল তখনকার ক্ষুদ্র এক রাজা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের পরিবর্ত্তে বশিষ্ঠকে পৌরো-হিত্যে বরণ করা লইয়া মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের পৌরোহিত্যে দলবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইলে সেই পুরোহিতের গৌরব বৃদ্ধি হয়। এইরূপে সে অন্যান্য পুরোহিতগণের ঈর্ষার স্থল হয়। কিন্তু সেই পূর্ব্বকালে যজ্ঞের বাহিরে আর পুরোহিতদিগের আধিপত্য বিস্তার হইতে দেখা যায় না। এখনো জাতির অবতারণা হয় নাই, সকলেই বিশ্ কিনা বসতিকারী, তাহাদিগের রাজার নাম হইতেছে বিশ্পতি; রাজবংশের মধ্য হইতে তিনি হয়ত সাধারণ সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইতেন। স্ত্রীরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল। ভাল ভাল কবিতা স্ত্রীকবি ও রাণীদিগের নাম বহন করে, অত্রি ঋষির কন্যা তন্মধ্যে একজন প্রধান। বিবাহ অতি পবিত্রভাবে দৃষ্ট হইত, পতি ও পত্নী উভয়েই গৃহের নিয়ন্তা এইজন্য পতি ও পত্নীকে একত্রে দম্পতী বলিত, দম্পতী দ্বিবচন, দম্ শব্দে গৃহ অর্থাৎ উভয়েই গৃহের পতি। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও সেই সকল ঘটনার অধিদেবতাদিগের অধীনতা স্বীকারেই তাহাদিগের ধর্ম্ম-ভাব ব্যক্ত হইত, কিন্তু দেবতাদিগেরও মনুষ্যের সহায়তায় নির্ভর করিতে হইত, এইরূপ এক প্রকার সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছিল। তখনকার নির্দ্দোষ অবস্থায় পাপের ভাবের সর্ব্বতোভাবে অভাব, এ কারণ সেই সময়কে সত্যযুগ বলায় বাধা নাই। তুমি আমাকে ধনধান্য দাও, আমি তোমাকে যজ্ঞদ্বারা বৃদ্ধি করিব, এইরূপ লেন-দেনের ভাব—পরিবর্ত্তের ভাব, ভিক্ষার ভাব নাই; এইরূপ তখন-কার স্বাধীন বিক্রম, আত্মগৌরব এখনকার অপেক্ষা পুরুষত্ব প্রকাশক। হিন্দুস্থানের জল বায়ুদ্বারা ক্রমে সে ভাব লোপ

পাইতে লাগিল। যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে, ব্রাহ্মণেরাই সিন্ধু-নদীর তীর হইতে হিন্দুস্থানে বাস করাইবার প্রধান কারণ;—কখন কখন তাহাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলেও।

যদিও ঋকের গানের প্রবৃত্তি এতটা প্রাথমিক কালে, কিন্তু ঋকসংহিতা বদ্ধ হইবার সময় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এ সময়ে ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য বেশ দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা কুরুপাঞ্চাল ও কোশল বিদেহদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের সময়ে। আবার যেমন অধিকাংশ গান হিন্দুস্থানে প্রবেশের সময় রচিত, তেমনি কতকগুলি গান সংহিতা হইবার সমকালীন প্রস্তুত হইয়া উহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকলের সঙ্গে অথর্ব্ব-বেদের সঙ্গে মিল আছে।

ঋগ্বেদের অধিকাংশ ভাগ নিম্নলিখিত দেবতাদিগেরই স্তব-স্তুতিতেই পূর্ণ:—প্রথম অগ্নি, অধিকাংশ সূক্ত এই দেবতাতেই সমর্পিত। তিনি মনুষ্যের নিকট হইতে দেবতাদিগের সন্নিধানে দূতস্বরূপ, তিনি দেবতাদিগের নিকট হবির্বাহক, তিনি মনুষ্য ও দেবতা এই উভয়ের মধ্যস্থ স্বরূপ, তিনি আপনার উদ্গত অর্চ্চি দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করেন,—যেমন পর্ব্বতবাসীরা সংকেতাগ্নি জ্বালাইয়া আপনাদের দলকে সমবেত করে। আবার অন্যত্র তিনি যজ্ঞীয় অগ্নিরূপে পূজিত হন; যজ্ঞের অন্নপাক প্রভৃতি কার্য্য অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হয় না এইজন্য উহার মহাখাতির। প্রাকৃতিক বলরূপে তাঁহার পূজার প্রচার নাই, তিনি অনেকটা যেন ঘরের দেবতা।

ইন্দ্র প্রকৃতির বলরূপে পূজিত। অগ্নির নীচে অধিকাংশ ঋক তাঁহাতেই প্রযুজ্য হইয়াছে। ইন্দ্র হইতেছেন বজ্রের দেবতা,

উহা দ্বারা তিনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল বিদীর্ণ করেন,—যাহাতে করিয়া সূর্য্যরশ্মি ও জল পৃথিবী উর্ব্বরা করতে সমর্থ হয়। অনেক অনেক ভাল ভাল সূক্ত সকল ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধবর্ণনায় পরিপূর্ণ। ঝড়ের বর্ণনাও আছে। বিদ্যুৎ লক্লক্ করিতেছে, বজ্র গড়্গড় করিতেছে, ভীষণ বাত্যাভিঘাত হইতেছে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের সরল মন ভয়ে ভীত হইত। প্রাতঃকালেরও স্তুতি আছে। উষাকে উজ্জ্বলা সুন্দরী স্ত্রী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, জ্বলন্ত সূর্য্যমণ্ডলকে গাঢ় ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন; সূর্য্য যখন উদিত হয় রজনীর অন্ধকার পরাজিত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে। উজ্জ্বল সূর্য্য দেবতা আলো ও উত্তাপের জন্য আহূত হন, যাহাতে করিয়া ধন (গোধন) ধান্য আনন্দে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে।

অগ্নি ইন্দ্র সূর্য্য এই তিন প্রধান দেবতা ছাড়া আরো অনেক দেবতা আছে, তন্মধ্যে প্রধান একদল দেবতা হইতেছেন মরুদ্গণ অর্থাৎ বায়ু, ইহারা যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের সখা—অর্থাৎ মেঘ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃষ্টির সঞ্চার করে—এবং রুদ্র হইতেছে শব্দায়মান ভয়ঙ্কর দেবতা, ইনি ভীষণ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ক্রমে জ্ঞানোন্নতিসহকারে আধ্যাত্মিক ভাবকে নৈতিক ভাবকেও মূর্ত্তি দিয়া অর্চ্চনা করিত, কিন্তু অবশ্য ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ঋগ্বেদের অর্থবোধসৌকর্য্যার্থে প্রধান দুই পুস্তক হইতেছে নিঘণ্টু এবং যাস্কের নিরুক্তি; ইহাদিগেরও আবার ভাষ্য আছে সে সকল আধুনিক,—পাঁচ শত বৎসরের এদিকে। সায়নাচার্য্যকৃত ঋকসংহিতার ভাষ্য উহাও এই সময়কার। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার

শিষ্যদিগের দৃষ্টি উপনিষদের উপরেই বিশেষ পতিত হইয়াছিল। শঙ্করের শিষ্য আনন্দতীর্থ ঋগ্বেদের কতক অংশের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উবট্ট ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যের একটা ভাষ্য করিয়াছেন।

এক্ষণে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা যাক।—ঋগ্বেদের দুই ব্রাহ্মণ: ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন্ বা কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে সকল যাগযজ্ঞের বিষয়, প্রধানরূপে সোমযাগের বিষয় বর্ণিত আছে; ঐতরেয়ে সোমযাগেরই বিষয় বাহুল্যরূপে বর্ণিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট আট পঞ্চিকা করিয়া চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে ত্রিশ অধ্যায়।

উভয় ব্রাহ্মণেই উল্লেখ আছে—আখ্যানবিৎ গাথা অভিযজ্ঞ-গাথা কারিকা। আখ্যানবিৎ অর্থাৎ পূর্ব্বকালের প্রচলিত প্রবাদ যাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ রচনা শ্রুতিপরম্পরায় প্রচারিত ছিল বোধ হইতেছে। ইহাতে কেবল তিন বেদের উল্লেখ আছে: ঋক যজু সাম; ইহারা ত্রয়ীবিদ্যা। এতদ্ভিন্ন পৈঙ্গি ব্রাহ্মণের বিষয়ও শ্রুত হওয়া যায়। কৌষিতকের মতকে শাংখায়ন গঠন দিয়াছেন, এই জন্য শাঙ্খায়ন বা কৌষিতকি ব্রাহ্মণ উহার আখ্যা। এই উভয় ব্রাহ্মণে, কোন কোন সূক্তের উৎপত্তির কারণ দর্শাইবার জন্য যে সকল উপাখ্যান ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত কার্য্যের,—যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় খণ্ডে শুনঃশেফের উপাখ্যান বিবৃত আছে। ব্রাহ্মণের লেখা অপেক্ষা উপাখ্যানের লেখা অনেক পুরাণ। অতএব বোধ হয়, ঐরূপ উপাখ্যান সব স্বতন্ত্র ভাবে প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে প্রয়োজনমত সেই সব

তোলা হইয়াছে। এই সকল আখ্যান দ্বারা পূর্ব্বকার রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেকটা ইতিহাস জানিতে পারা যায় এবং পরবর্ত্তী আখ্যান উহা হইতে কেমন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও টের পাওয়া যায়।

এই প্রত্যেক ব্রাহ্মণে আবার এক একটী আরণ্যক যোগ করা আছে; আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্যখণ্ড তাহা অরণ্যে পাঠ্য, যাঁহারা সংসারাশ্রম ছাড়িয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ ছাড়িয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন তাঁহারাই সেই সকল পাঠের যোগ্য হইবেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক গভীর চিন্তার ভাব রহিয়াছে। ব্রাহ্মণে যেমন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্যিক ক্রিয়ার উপর দৃষ্টি ইহাতে তেমনি অন্তর্দৃষ্টি—ইহা হইল শেষ ফল। আরণ্যক এই জন্য ব্রাহ্মণের শেষভাগ—পরিশিষ্ট।

ঐতরেয় আরণ্যক পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত; ইহার প্রতি খণ্ডকেও আরণ্যক বলে। আবার ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্র হইয়া একটা স্বতন্ত্র উপনিষদ হইয়াছে; আবার এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ চারি উপখণ্ড,—যাহাতে বেদান্ত মত বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়,—লইয়া ঐতরেয় উপনিষৎ আখ্যা ধারণ করিয়াছে। মহিদাস ঐতরেয় এই উভয়ের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া আখ্যাত। ইহার পিতার নাম বিশল এবং মাতার নাম ইতরা বলিয়া অনুমিত। ইতরা হইতে তদ্ধিৎ দ্বারা ঐতরেয় হইয়াছে। ইহার গ্রন্থে ইহারই বাক্য সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে; অতএব উঁহারই মত ইহাতে বিবৃত তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু যখন উঁহারই গ্রন্থে উঁহারই বাক্য সিদ্ধান্ত বাক্য বলিতেছে, তখন প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, উঁহার মত শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া

আসিয়া ক্রমে একটা নির্দ্দিষ্ট গঠনে পরিণত হইত; কিন্তু বরাবর উঁহার নামে চলিয়া আসিত। আরণ্যকের চতুর্থখণ্ড শৌনকের শিষ্য আশ্বলায়নের প্রণীত এবং পঞ্চমখণ্ড শৌনক প্রণীত।

কৌষীতকারণ্যক তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দুই খণ্ড অধিকাংশ ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণেই পূর্ণ। তৃতীয় খণ্ডের নাম কৌষীতকি উপনিষৎ। প্রথম খণ্ডে দেবলোকে যাইবার পথ এবং তথায় উপস্থিত হওয়ার বিবরণ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ড বিধানের মধ্যে ঐ সময়কার পরিবারবন্ধনের অনুরাগ ও ভালবাসার বেশ মনোরম ছবি পাওয়া যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র সেই সেই দানব প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন মহাভারত কাব্যে অর্জ্জুন যাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে শুক্লযজুর আরণ্যকেও যে গল্প ইহাতেও সেই, অর্থাৎ কাশীর রাজা ক্ষত্রিয় অজাতশত্রুর নিকট হইতে স্বয়ং পণ্ডিতম্মন্য একজন ব্রাহ্মণের উপদেশলাভ। এ সময় আর্য্যস্থানের সীমা হইতেছে হিমবৎ ও বিন্ধ্য। এখন হইতে গঙ্গার নাম শ্রুত হওয়া যায়;—যেমন চিত্রগঙ্গায়নি অরুণিকে উপদেশ দিতেছেন।

এই উভয় আরণ্যকেরই অর্থাৎ ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের এবং কৌষীতকি আরণ্যকের তৃতীয় খণ্ডের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য আছে;—খৃষ্ট অষ্টশতাব্দে ইঁহার জন্ম। ইনি বেদান্তমতের প্রধান অবলম্বী, এই জন্য তিনি উপনিষদের অর্থকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপনার মতের পোষণ করিয়াছেন, সেইগুলা ছাড়িয়া দিয়া লইলেও তাঁহার দ্বারা মহোপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার আবার ছাত্রেরা,—যেমন আনন্দজ্ঞান আনন্দগিরি আনন্দ-

তীর্থ,—তাঁহার ভাষ্যের আবার ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সে সকলও এখন মুদ্রিত হইয়া গেছে। ঋগ্বেদের আরো দুইটা উপনিষদ আছে : মৈত্রায়নি উপনিষৎ এবং বাষ্কল উপনিষদ। বাষ্কলের যেমন ঋকসংহিতা ছিল, তেমনি বাষ্কলের ব্রাহ্মণ ছিল। সায়না-চার্য্য বাষ্কলশ্রুতির অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন; এই উভয় গ্রন্থই এখন নিরুদ্দেশ হইয়াছে কেবল বাষ্কল উপনিষদ মাত্র আছে।

এখন ঋগ্বেদের সূত্র সাহিত্যে আসা যাক :—

বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিবিধ সূত্র প্রচারিত আছে;—শ্রৌত বা কল্পসূত্র এবং গৃহ্য বা স্মার্ত্ত সূত্র। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালী ব্যক্ত করা হইতেছে শ্রৌতসূত্রের উদ্দেশ্য। আমরা ইহার দুই গ্রন্থ দেখিতে পাই, এক বার অধ্যায় বিশিষ্ট আশ্বলায়ন সূত্র আর এক আঠার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ শাঙ্খায়ন সূত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে আশ্বলায়ন সূত্রের যোগ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের সঙ্গে শাঙ্খায়ন সূত্রের যোগ। উভয় গ্রন্থে উভয় গ্রন্থ হইতে অবিকল বাক্য উদ্ধৃত আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদে পাওয়া যায় অশ্বল নামে একজন বিদেহ-রাজ জনকের হোতা ছিলেন, অশ্বল হইতে হয়ত আশ্বলায়ন হইয়াছে অর্থাৎ অশ্বল ঐ মতের আবিষ্কর্ত্তা। বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ এই সকল হইতেছে শ্রৌতসূত্রের বিষয়।

শ্রৌতসূত্রের মত আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়নের দুইটী ঋগ্বেদের গৃহ্যসূত্রও আছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র চার অধ্যায়ী, শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ষড়ধ্যায়ী। শৌনক গৃহ্যসূত্রেরও নাম শ্রুত হওয়া যায়। ইহাতে বিবাহ তর্পণ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার পারিবারিক

অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত আছে। তর্পণের সময় বিখ্যাত পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে আহ্বান করিবার নিয়ম ছিল,—এখন যেমন মূর্ত্তি প্রভৃতি গড়ান হয়, তখন তেমনি অনুষ্ঠানের সময় তাঁহাদিগকে স্মরণে আনিবার রীতি ছিল। যাঁহারা কোনরূপে বেদকে প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পিতৃতর্পণের সময় আহ্বান করিবার রীতি ছিল। এই বিধান সূত্রেতেই পাওয়া যায়,—যেমন, বাস্কল শাকল্য মাণ্ডুকেয় ঐতরেয় পৈঙ্গ্য কৌষীতক শৌনক আশ্বলায়ন শাখ্যায়ন; আবার বিখ্যাত মহিলাদিগেরও নাম আছে—যেমন, গার্গী বাচক্লবী সুলভা মৈত্রেয়ী।

এখনকার প্রচলিত ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যসূত্র, তাহা শৌনকের বলিয়া বিখ্যাত; ইহা তিন কাণ্ডে বিভক্ত, প্রতি কাণ্ডে ছয় পটল, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৩ কাণ্ডিকা; এই পুস্তক ছন্দে রচিত।

অনুক্রমণী যাহাতে ছন্দ দেবতা এবং সূক্তপ্রণেতা ঋষিদিগের নাম রহিয়াছে এরূপ শৌনকের অনুবাকানুক্রমণী আর কাত্যায়-নের সর্ব্বানুক্রমণী বিদ্যমান আছে। শৌনকের কৃত বৃহদ্দেবতার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সামবেদ।

এক্ষণে সামবেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ঋকসংহিতার যে সকল ঋক সোমযাগে উচ্চারিত হইত, সেইগুলা ভজনস্বরে বসান হইয়াছিল;—তাহাই সামবেদ হইল। সাম সংহিতার দুই খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ছয় প্রপাঠক, প্রতি প্রপাঠক দশ দশতে বিভক্ত। প্রতি দশত দশ পদ্যে বিভক্ত। প্রথম বার দশতে অগ্নির, শেষ এগার দশতে সোমের এবং মধ্যের ছত্রিশটীতে প্রধানত ইন্দ্রের স্তুতি। সামসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড নয় প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতি প্রপাঠক কখন দুই কখন বা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার প্রতিভাগে তিন বা অধিক পদ্য আছে।

সামসংহিতাতে এই সকল ছন্দ ঋকের আকারেই আছে, কেবল তাহাদের উপর সামের চিহ্ন দেওয়া; কিন্তু সামসংহিতা ছাড়া আবার চারিটী বই আছে, তাহাকে সামগান বলে, তাহাতে ছন্দগুলিতে সব গানের চিহ্ন দেওয়া আছে এবং গানের বেশী বেশী কথা বসাইতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটী গ্রন্থ: এক গ্রামগেয় গান, এক আরণ্য গান, ইহাদের ছয় প্রপাঠক। সামসংহিতার প্রথম ভাগ অনুসারে ইহাদের ছন্দ প্রণালী; এই দুইয়ের যে একটী পুরাতন অনুক্রমণী আছে তাহার নাম ঋষিব্রাহ্মণ, তাহাতে ছন্দসমূহের ঐ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। আর দুই পুস্তক: এক উহগণ আর এক উহ্যগণ। প্রথমটীর তেইশ

প্রপাঠক, দ্বিতীয়টীর ছয় প্রপাঠক, ইহারা সংহিতার দ্বিতীয় ভাগের ছন্দশ্রেণী অবলম্বন করে। সামসংহিতায় ১৫৪৯ ঋক, তাহার ১৫০০ ঋক প্রায় ঋকসংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকাংশ অষ্টম এবং নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত। সামবেদের তিনটী শাখা কৌথুম শাখা রাণায়নীয় শাখা এবং জৈমিনীয় শাখা। আমরা * হইতেছি সামবেদী কৌথুম শাখা।

সামবেদের ঋকপাঠ ঋগ্বেদের ঋকপাঠের অপেক্ষা পুরাতন বোধ হয়। অসভ্যাবস্থায় যাহা কিছু ছন্দ তৈয়ারী করে সবটা গান গাহিয়া তৈয়ারী করে, তারপরে সেই গান হইতে ছন্দটা ঘষিয়া মাজিয়া পরিপাটি করিয়া আলাদা বাহির করিয়া লয়। ঋকসংহিতায় সেইরূপ হইয়াছে, গান হইতে ক্রমে ছন্দের দিকে দৃষ্টি গিয়াছে। তাহাতে করিয়া সামসংহিতার ঋক সকল প্রায়ই ঋকসংহিতাতে দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঋগ্বেদের আধুনিক অংশ সামবেদে পাওয়া যায় না। সামবেদের গান ছন্দে পরিণত হইতে হইতে ঋকসংহিতার সময় যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, সেই অবস্থায় ঋকসংহিতায় নিবিষ্ট হইয়াছিল; এই সঙ্গে যে সকল সূক্ত গানে বসান হয় নাই, ছন্দ আকারে ছিল সবটা ঋগ্বেদে আসিল। ঋগ্বেদ যেন ঋষিদিগের আমলের কাব্যসংগ্রহ হইল। ঋগ্বেদ পাঠ করিলে তখনকার ঋষিদিগের আশা ভরসা কল্পনা মনের ভাব সব টের পাওয়া যায়। সামবেদ হইল তখনকার ভজন-গান। ব্রাহ্মণ হইল বেদের সমালোচক, কিন্তু সমালোচনা করিতে গিয়া বেদকে বজায় করিয়া ক্রমে বেদকে ছাড়াইয়া উঠিল।

---

* এখানে গ্রন্থকার নিজ গোষ্ঠীর কথা বলিয়াছেন।

সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হইতেছে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ; ইহা পঁচিশ খণ্ডে বিভক্ত, এইজন্য ইহার আর এক নাম হইতেছে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। নানাবিধ সোমযাগ ও তাহাতে যে সকল সাম গান হইত, তাহারি বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে।

সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কতক দিন ধরিয়া প্রস্তুত হইতে হয়। সে সকল দিনকে ধরা যাইতেছে না। কোন কোন সোমযাগে কেবল একদিন মাত্র সোমরস নিংড়াইয়া বাহির করিবার বিধি, কোন কোনটাতে দুই দিন, এই প্রকার সোমরস নিংড়াইবার দিনকে সুত্যাদিন কহে। যে সকল সোমযাগে একটী-মাত্র সুত্যাদিন তাহাদিগকে একাহ বলে, যে সকল যাগে দুই হইতে বারো সুত্যাদিন তাহাদিগকে অহীন বলে। দ্বাদশ অপেক্ষা অধিক সুত্যাদিন থাকিলে তাহাকে সত্র বলিত। ব্রাহ্মণরাই কেবল সত্র করিবার অধিকারী। তাহা এক আধ জন ব্রাহ্মণেরও কর্ম্ম নয়, অনেক ব্রাহ্মণে মিলিয়া মিশিয়া তাহা করিতে হইত। এই যাগ সম্পন্ন হইতে এক শ দিনও লাগিতে পারে, অনেক বৎসরও লাগিতে পারে। যে সকল সত্র সম্পন্ন হইতে এক বৎসর বা ততোধিক কাল লাগিত তাহাকে অয়ন কহিত।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সোমযাগ ব্যতীত ব্রাত্যস্তোমের বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যে সকল আর্য্যজাতি হিন্দুস্থানের আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারে নাই, হয়ত আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রথানুসারে চলিয়াছে নয়ত এখানকার আদিমবাসীদিগের ধরণধারণ পাইয়াছে, তাহাদিগকে পতিত বা ব্রাত্য কহিত; তাহাদিগকে পাংক্তেয় করিতে হইলে ব্রাহ্মণদলে আনিতে হইলে ব্রাত্যস্তোম যাগ করিতে হইত। ব্রাত্যদিগের

এইরূপ বর্ণনা আছে;—তাহারা ধনুর্ব্বাণ ও ভল্লহস্তে লইয়া খোলা যুদ্ধরথে চড়িয়া বেড়ায়; তাহাদের পরিধান মস্তকে উষ্ণীষ এবং লাল পাড়ের উত্তরীয় দুইদিকে বাতাসে উড়িতেছে; পায়ে জুতা, ভেড়ার চামড়া দোভাঁজ করা তাহাই আঙরখা, তাহাদের প্রধানদিগের পিঙ্গল রঙ্গের পরিধান এবং গলায় রূপার গহনা। তাহারা না ক্ষেত্র কর্ষণ করে না বাণিজ্য ব্যবসায় করে। তাহাদের আইন গোলমেলে। যদিও ব্রাহ্মণদিগের ও তাহাদিগের ভাষা একই তথাপি ব্রাহ্মণদিগের নিকট যাহা সহজ-উচ্চার্য্য তাহারা তাহা কঠিন বোধ করে।

সামবেদের আর একটী ব্রাহ্মণের নাম ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। এটী উপরোক্ত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে যেগুলা নাই, তাহাই ইহাতে আছে, বিশেষতঃ অঘটন ঘটনা সকল নিবৃত্তি করিবার এবং মারণ চাটন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিষয় আছে। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়কে স্বতন্ত্র করিয়া তাহার নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাই আছে। সাধারণ অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে যেরূপ করিতে হয়, গো মনুষ্যের পীড়া হইলে যেরূপ করিতে হয়, শস্য নষ্ট হইলে যেরূপ করিতে হয়, ভূমিকম্প উল্কাপাত তাড়িৎ ব্যাপার দেখা দিলে যেরূপ করিতে হয় ইহাতে সেই সকল বিষয় আছে।

সামবেদের তৃতীয় ব্রাহ্মণ হইতেছে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। ছন্দোগ বলিতে সামগান বুঝায়, তাহার ব্রাহ্মণ, তাই ইহাকে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বলে; ইহাকে ছান্দোগ্য উপনিষৎও বলে। ইহাতে কৃষ্ণ দেবকীপুত্রকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলিয়া

উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কৃষ্ণ আঙ্গিরস বলিয়া একস্থলে উল্লেখ আছে। অতএব বেদের মধ্যে কৃষ্ণের ছাত্রাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরে কি কর্ম্ম করাতে যে তাঁহার দেবত্ব পুরস্কার হইল তাহা পুরাণাদি দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

সামবেদের আরেক উপনিষদ হইতেছে কেনোপনিষৎ; ইহার আরেক নাম হইতেছে তলবকারোপনিষৎ। ইহার দুই ভাগ; প্রথম ভাগে ব্রহ্মের স্বরূপ শ্লোকে এবং দ্বিতীয় ভাগে আখ্যায়িকা দ্বারা অন্য দেবতার উপর ব্রহ্মের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। সংহিতোপনিষৎ নামে সামবেদের আর এক উপনিষৎ আছে।

সামবেদের সূত্রগ্রন্থ অন্য বেদের অপেক্ষা বেশী:—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের উপর একটী এবং আর তিনটী শ্রৌতসূত্র। ছন্দের উপর এবং ঋককে সামে কেমন করিয়া পরিণত করিতে হয় এই দুই প্রকারের পাঁচটী এবং একটী গৃহ্যসূত্র; এতদ্ব্যতীত নানা পরিশিষ্ট আছে।

মশকের শ্রৌতসূত্র হইতেছে প্রধান; ইহাকে আর্ষেয় কল্পও বলে; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ইহার প্রধান অবলম্বন। ইহা একাদশ প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে একাহ যজ্ঞের বিষয়, তার পরের চার অধ্যায়ে অহীন যজ্ঞের বিষয় এবং অবশিষ্ট দুই অধ্যায়ে সত্রের বিষয় উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় হইতেছে লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্র; ইহা সামবেদের কুথুম শাখার। ইহা দশ প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রথম সাত প্রপাঠকে সাধারণ সোমযাগের নিয়ম। অষ্টম এবং নবম প্রপা-

ঠকের কতক অংশে একাহের নিয়ম, নবমের অবশিষ্ট অংশে অহীনের নিয়ম এবং দশমে সত্রের নিয়ম।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, যে সকল আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের দলস্থ হয় নাই তাহাদিগকে ব্রাত্য বা ব্রাত্তীন বলিত। ব্রাত্তীনেরা যদি ব্রাহ্মণদলে আসিতে চাহিত তাহা হইলে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে ব্রাত্যস্তোম করিতে হইত এবং ব্রাহ্মণদলে ভুক্ত হইলে ভুক্ত হইবার অগ্রে তাহার যাহা কিছু থাকে সব তাহার সঙ্গী ব্রাত্যদিগকে দিয়া আসিতে হয়। ঐরূপ দেওয়াতে তাহাদিগের পূর্ব্ব পাপও তাহাদের উপর অর্পণ করা হইল অর্থাৎ পাপার্জ্জিত ফলত্যাগের সহিত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইল। ব্রাত্তীনদিগের মধ্যেও যৌধ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং অর্হন্ত অর্থাৎ পুরোহিত বা আচার্য্যশ্রেণী ছিল। ব্রাত্তীনেরা যেমন ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেন তেমনি তাঁহাদিগেরও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে কথিত শ্যেনযাগ লাট্যায়নে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ইহা মারণ যাগ। ইহা দ্বারা অথর্ব্ববেদের ভাব মনে আসে। ইহাতে করিয়াই মনে হয় ব্রাত্যদিগের অনুশীলিত ঋক লইয়াই অথর্ব্ববেদ অধিকাংশ সংহিত হইয়াছে; আঙ্গিরস ঋষি সেই সংগ্রহের একজন কর্ত্তা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশে এবং তখনকার সময়ে প্রচলিত ঋক সকলও ঐ সঙ্গে সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্রাত্তীনদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ ছিলেন তাঁহাদিগকে অনুচান বলিত। শাণ্ডিল্যের মতে অর্হন্তেরাই অনুচান হইতে পারে। অনুচানেরাই শ্যেনযাগে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে পারে। লাট্যায়ন বলেন ইহাদের বস্ত্র ও উষ্ণীষ

লোহিত বর্ণ হইবে। এই সময়ে শূদ্র দস্যু এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকটা মেশামিশি ভাব ছিল। তাহারা যজ্ঞভূমির ভিতরে না যাক বাহির হইতে যাগযজ্ঞ দেখিতে পাইত, বেদধ্বনি শুনিতে পাইত, যজ্ঞের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মও করিতে পাইত। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যভাব যত বদ্ধমূল হইল তত তাহাদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল।

সামবেদের আরেকটা দ্রাহ্যায়ন সূত্র আছে ইহা রাণায়ণীয় শাখার। রাণায়ণী হইতেছেন বশিষ্ঠ গোত্রীয়, এইজন্য ইহাকে বাশিষ্ঠ সূত্রও বলে।

আর একটা হইতেছে দশ প্রপাঠক বিশিষ্ট অনুপদ সূত্র। ইহা পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ মূল ধরিয়া দুরূহ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই চারিটি সূত্রগ্রন্থ (মশকের শ্রৌতসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, দ্রাহ্যায়ন সূত্র ও অনুপদ সূত্র) পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে। ইহাদিগকে অবলম্বন না করিয়া স্বতন্ত্র প্রকারেরও অনেক সূত্র আছে: যেমন নিদান সূত্র; ইহা দশ প্রপাঠক গ্রন্থ; ইহাতে সামের উকৃথ স্তোম গানের ছন্দ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা আছে। গোভিলের পুষ্পসূত্র এবং সামতন্ত্র। প্রথম গ্রন্থে ঋকদিগকে পুষ্পিত করিয়া কিরূপে সামে পরিণত করিতে হয় সেই সকল নিয়ম আছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের কিরূপ স্বরভেদ তাহাই বর্ণিত আছে। এই দুই গ্রন্থে ব্যাকরণের ভাব বিদ্যমান। এরূপ আরও অনেক সূত্রগ্রন্থ আছে।

গোভিলকৃত সামবেদের একটী চারি প্রপাঠকবিশিষ্ট গৃহ্যসূত্র আছে এবং কাত্যায়ন প্রণীত ক্রমপ্রদীপ নামে তাহার পরিশিষ্ট

আছে—ইহা সামবেদের দ্বিতীয় গৃহ্যসূত্র বলিয়াও স্বীকৃত হয় এবং ইহাকে স্মৃতিশাস্ত্রও বলে। আর একটা হইতেছে খাদির প্রণীত গৃহ্যসূত্র। এতদ্ব্যতীত পদ্ধতি পরিশিষ্ট আরো অনেক আছে। তাহার মধ্যে সামসংহিতার নৈগেয় শাখার আর্ষ এবং দৈবত পরিশিষ্ট প্রধান অর্থাৎ এই দুই পরিশিষ্টে ঋষি এবং দেবতাদিগকে সংখ্যা করা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ।

অন্য সকল বেদ অপেক্ষা যজুর্ব্বেদের শাখা অনেক; এই জন্য যজুর্ব্বেদের একটা সংস্কৃত নামই হইতেছে শতশাখ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে যজুর্ব্বেদটা অনেকের পাঠ্য ছিল, যেহেতু সমস্ত যজ্ঞকাণ্ডটা যজুর্ব্বেদের অধিকৃত। সামবেদে সোমযাগেরই মন্ত্র দেখা যায়; ঋগ্বেদে সোমযাগেরই অধিক এবং আর আর যাগের মন্ত্রও আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদে সমস্ত যাগেরই উল্লেখ আছে। যজুর্ব্বেদের অর্থই হইতেছে যজ্ঞের বেদ। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে বহ্বৃচ্ বলে, সামবেদীকে ছান্দোগ ও যজুর্ব্বেদীকে অধ্বর্য্যু বলে। যজুর্ব্বেদের প্রধান দুই শাখা: কৃষ্ণ যজু এবং শুক্ল যজু। কৃষ্ণ যজুতে শৃঙ্খলা ভাল নাই, উহাতে মন্ত্র এবং অর্থ এবং যজ্ঞক্রিয়া সব একত্র রহিয়াছে;—সংহিতা ও ব্রাহ্মণে

যেন মিশিয়া রহিয়াছে। শুক্লযজুতে সেরূপ নাই; ইহাতে মন্ত্র তাহার অর্থ এবং যজ্ঞভাগ সব পৃথক পৃথক রহিয়াছে। অন্যান্য বেদের ন্যায় শুক্ল যজুঃসংহিতাতে কেবল মন্ত্রভাগ আছে। তাহার অর্থ ও যজ্ঞীয় ভাগ উহার ব্রাহ্মণেতে রহিয়াছে। আর কৃষ্ণ যজুতে আর এক বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হোতা ও তাহার কর্ত্তব্যের প্রতি কৃষ্ণ যজু সর্ব্বদাই মনোযোগী; শুক্ল যজু কখন কখন মাত্র।

কৃষ্ণযজু ও শুক্লযজু শাখাবলম্বীদিগের মধ্যে ভারী বিবাদ। শুক্লযজুর্ব্বেদীরা আপনাদিগকে সাধারণ রূপে অধ্বর্য্যু বলেন এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীদিগকে নরকে প্রেরণ করেন, চরকাচার্য্যকে দুষ্কৃতিতে অর্পণ করেন। কৃষ্ণযজুর মধ্যে একটা চরক শাখা ছিল। কৃষ্ণযজুর দ্বিতীয় নাম হইতেছে তৈত্তিরীয় যজু। তিত্তিরি ঋষি হইতে তৈত্তিরীয় নাম হইয়াছে। আর একটা প্রবাদ আছে যে, বৈশম্পায়নের ছাত্রদিগের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বৈশম্পায়নের কি বিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে বৈশম্পায়ন, শিষ্যকে পাঠ ফিরাইয়া দিতে বলেন; তিনি তাহা বমন করিয়া দিলেন। বৈশম্পায়নের অন্য ছাত্রেরা তিত্তিরি পক্ষী হইয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তাহাতে ঐ কৃষ্ণযজুর নাম তৈত্তিরীয় যজু হইল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজ ক্ষমতায় শুক্লযজু প্রস্তুত করিলেন।

কৃষ্ণযজুর দুই বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আপস্তম্ব শাখার তৈত্তিরীয় সংহিতা আর চরক শাখার কাঠক সংহিতা।

আপস্তম্ব শাখার সংহিতাকে সাত কাণ্ড; এক এক কাণ্ডে ৪৪ প্রশ্ন বা প্রপাঠক, ৬৫১ অনুবাক এবং ২১৯৮ কাণ্ডিকা। ৫০ কথায় এক এক কাণ্ডিকা হয়। চরক শাখার কাঠক

সংহিতার পাঁচ কাণ্ড। তৈত্তিরীয় সংহিতার পরিশিষ্ট হইতেছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তাহার আরণ্যক ভাগ হইতেছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক; ইহার দশ কাণ্ড। প্রথম ছয় কাণ্ডে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। তাহার পরে চারি কাণ্ডে দুই উপনিষৎ হইয়াছে—সপ্তম অষ্টম নবম কাণ্ডের নাম হইতেছে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, দশম কাণ্ডের নাম হইতেছে যাজ্ঞিকী বা নারায়ণীয় উপনিষৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তিন ভাগ। প্রথম ভাগের নাম সংহিতোপনিষৎ বা শিক্ষাবল্লী, ইহাতে বিশ্বাত্মার একত্বের বিষয় আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম আনন্দবল্লী এবং তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী; এই দুই ভাগের একত্র নাম হইতেছে বারুণী উপনিষৎ—ইহাতে পরমাত্মার সহিত যোগে ব্রহ্মানন্দের বিষয় বর্ণিত আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও কৃষ্ণযজুর। কৃষ্ণযজুর আর একটা উপনিষৎ আছে মৈত্রায়ণ উপনিষৎ। কৃষ্ণযজুর শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্র আছে।—শ্রৌতসূত্র যেমন কঠসূত্র, মনুসূত্র, মৈত্রসূত্র, লৌগাক্ষিসূত্র, ভারদ্বাজীয় সূত্র। এইরূপ গৃহ্যসূত্রও আছে, যেমন, কাঠক, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, সত্যাষাঢ়। কৃষ্ণযজুর প্রাতিশাখ্যসূত্র এবং অনুক্রমণীও আছে।

এক্ষণে শুক্লযজুতে আসা যাক। ইহাতে যজ্ঞের মন্ত্র সকল তাহাদের ব্যাখ্যান প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে এবং বেশ প্রণালী পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ আছে। কৃষ্ণযজুর মত ইহাতে গোলমাল নাই। এইজন্য ইহার নাম হয়ত শুক্লযজু হইয়াছে অর্থাৎ বেশ পরিষ্কার—গোলমাল বিশৃঙ্খলা নাই।

শুক্লযজুর আর এক নাম যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পিতৃনাম হইতে আসিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পিতার নাম ছিল বাজসনি; তাহা

হইতে লোকে যাজ্ঞবল্ক্যকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া বাজসনেয়ি বলিত। তাহা হইতে শুক্লযজুর নাম হইয়াছে বাজসনেয়ি সংহিতা। যাহারা শুক্লযজুর্ব্বেদপাঠক তাহাদিগকে বাজসনেয়ক এবং বাজসনেয়ী বলে।

শুক্লযজুর দুই শাখা: এক কাণ্ব আর এক মাধ্যন্দিন শাখা। এই উভয় শাখার সংহিতাতেই ৪০টী করিয়া অধ্যায় আছে। মাধ্যন্দিন শাখার এই ৪০ অধ্যায় আবার ৩০৩ অনুবাক এবং ১৯৭৫ কাণ্ডিকায় বিভক্ত। প্রথম ২৫ অধ্যায়ে যজ্ঞের সাধারণ মন্ত্র সকল রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দর্শপৌর্ণমাসী যাগ; তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাতঃ এবং সায়ংকালীন হোমবিধি এবং চাতুর্মাস্য যাগ। চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলিতে সাধারণ সোমযাগ এবং নবম ও দশম অধ্যায়ে এই সোমযাগের অন্য দ্বিবিধ পরিণাম; একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে যজ্ঞীয় অগ্নির বেদী নির্ম্মাণ; উনবিংশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে সৌত্রামণি যাগের বিষয় আছে—এই সৌত্রামণি যাগ, অতিরিক্ত সোমরস পানের দোষাপনয়নের প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলিতে অশ্বমেধের বিধান আছে। ইহার পরে যে পঞ্চদশ অধ্যায় তাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। ছাব্বিশ অধ্যায় হইতে পঁয়ত্রিশ অধ্যায় পর্য্যন্তকে খিল অর্থাৎ পরিশিষ্ট বলে। ছত্রিশ অধ্যায় হইতে উনচল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলিকে শুক্রীয় কাণ্ড অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের কাণ্ড বলে। ত্রিশ হইতে উনচল্লিশ পর্য্যন্ত অধ্যায়সমূহে নূতন প্রকার যজ্ঞীয় প্রকরণের বিধান পাওয়া যায়, যেমন পুরুষমেধ অর্থাৎ নরবলী, সর্ব্বমেধ, পিতৃমেধ এবং প্রবর্গ্য যদ্দ্বারা যাজ্ঞিক দিব্য-

শরীর প্রাপ্ত হয়। চল্লিশ অথবা শেষ অধ্যায়টা হইতেছে উপনিষৎ—ঈশোপনিষৎ। বাজসনেয়িসংহিতা অর্দ্ধেক ছন্দে অর্দ্ধেক গদ্যে। ছন্দভাগটা প্রায়ই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সামবেদের ঋক্ ঋগ্বেদের ঋক্ হইতে যতটা ভিন্ন, যজুর্ব্বেদের ঋক্ অত ভিন্ন নহে; যজুর্ব্বেদে কেবল যজ্ঞের ভাবের উপযোগী করিবার জন্য মূলকে একটু একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

মাধ্যন্দিন শাখার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পর হইতে সবগুলিই অপেক্ষাকৃত নূতন রচনা। কেননা কেবল এই আঠার অধ্যায়ে যে সকল মন্ত্র আছে, তৈত্তিরীয় সংহিতাতে তাহাই আছে, আর অশ্বমেধেরও কতকগুলি মন্ত্র ইহাতে আছে। অশ্বমেধের অবশিষ্ট মন্ত্র এবং সৌত্রামণি ও নরমেধের মন্ত্র সকল তৈত্তিরীয় সংহিতাতে নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেতে আছে। আর সর্ব্বমেধ, সুক্রিয় যাগ এবং পিতৃমেধ এসকল আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে। তেমনি শুক্লযজুর ব্রাহ্মণেতেও প্রথম নয় অধ্যায়ে, মাধ্যন্দিন সংহিতার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতি কথা ধরিয়া ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সৌত্রামণি, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ এবং পিতৃমেধ এবং প্রবর্গ্য, যাহা মাধ্যন্দিনের উনিশ হইতে পচিশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে আছে, তাহার কতকগুলি মন্ত্র মাত্র শুক্লযজুর ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে:—তাহা কেবল প্রথম ও শেষ কথার দ্বারা অথবা অনুবাকের প্রথম ও শেষ কথার দ্বারা, তাহার অর্থ প্রভৃতি কিছু বিবৃত নাই। যেমন ঋগ্বেদের সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য প্রসিদ্ধ, সেইরূপ শুক্লযজুর মহীধরকৃত ভাষ্যও প্রসিদ্ধ।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম। *

আর্য্যজাতি] ঋগ্বেদ সংহিতার পুরাতন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, আর্য্যেরা হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে—পঞ্জাব কাশ্মীর এবং পঞ্জাব ছাড়াইয়া কুভানদীর তীরে বসতি করিয়াছিল। এই সকল আড্ডা হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বভাগে হিন্দুস্থানের মধ্যে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিস্তার হইবার বিষয়, তাহারা স্তরে স্তরে চিহ্ন বৈদিক গ্রন্থের শেষ অংশসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরাণ হইতে এই জেতৃজাতির পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম এবং দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে' যে, এই অসীম ভারতখণ্ড, যাহা তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং বলবান বন্যজাতির বাসস্থান ছিল, তাহাকে হিন্দুধর্ম্মে আনিতে কত শতাব্দী গত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে, উহার প্রথমাবস্থায় উহা এতটা প্রাচীন, যে তখন আর্য্য এবং পারসীক সব একত্র মেশা-মেশিরূপে বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পাহাড়ীরা যেমন এক জায়গায় বাস করিলেও আলাদা আলাদা দলে বাস করে তেমনি

---

* Weber's History of Indian Literature হইতে অনুবাদ।

আর্য্যজাতি ও পারসীক প্রভৃতি জাতি একত্র থাকিলেও তাহাদের মধ্যে দলের প্রভেদ ছিল।

দেবতা] আবার ঋগ্বেদের ভাব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগের সতেজ ভাবটা প্রকৃতির সম্বন্ধে সহজ উচ্ছ্বাসে টাটকা টাটকা রকমে নবীনভাবে ছেলেমানুষী ভাবে বাহির হইতেছে। আর্য্যেরা প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ডরূপে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, স্বতন্ত্র দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির আয়তন কল্পনা করিয়া সেই সেই আয়তনের মধ্যে তাহাদের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য প্রার্থনা করিত। এই প্রকৃতিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক আবির্ভাবকে (Phenomenon) অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা জ্ঞান করিত। যত প্রকার ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদয় হইতে পারে হিন্দুধর্ম্মে সে সব হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক প্রকৃতির আবির্ভাব যাহা প্রথমে কল্পনাতে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে যে যেখানে প্রকাশ পায়, সেই ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বা মণ্ডলে শ্রেণিবদ্ধ করা হইল এবং তাহাদিগের সকলের মধ্যে একটা সাদৃশ্য প্রকাশ পাইল। এইরূপে কতকগুলি দেবতা কল্পনা করিয়া লইলে তাহারা যেন আপনাপন এলাকায় প্রত্যেকে একাধিপত্য করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অধিকার মনুষ্যজীবনের ঘটনাসমূহে বিস্তার হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আবার মনুষ্যের স্বরূপ ও অবয়বরাজিও দেবতাদিতে অর্পিত হইয়া পড়িল। স্বাভাবিক বলের প্রতিভূস্বরূপ এই সকল প্রকৃতিদেবতা অনেকগুলি হইলেও তাহাদিগের আবার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কল্পিত হইয়া দেবতাদিগের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আবার

এই সকলে দৈবশক্তি, ব্যক্তিগত সত্তা ও ক্রিয়া আরোপিত হইল। পরে যখন আলোচনার কাল আসিল, তখন ঐ বহুবিধ দেবতাদিগের মধ্যে, তাহাদের মোটামুটি ভাব অনুসারে, থাকবন্দি করিয়া একটা শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যেমন দ্যুলোকের দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা, পৃথিবীর দেবতা। সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি ঐ ঐ স্থানের প্রধান প্রতিভূ ও শাসিতা বলিয়া গণিত হইল। এই তিন দেবতা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেবতার উপরে পদ পাইল—অন্য দেবতারা যেন ইহাদিগের আশ্রিত ও ভৃত্যভাবে রহিল।

যখন একবার এই শ্রেণিবদ্ধ হইয়া পাকা হইয়া দাঁড়াইল, তখন আবার আলোচনা আন্দোলন ও এই তিনের আপেক্ষিক সম্বন্ধ (relative position) নির্ণয়, করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রধান দেবতা যে ব্রহ্ম তাঁহাতে গিয়া একতা পাইল। তখন এই তিন আবার ব্রহ্মের সৃষ্ট ও ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইল। অথবা এই তিনের যখন যাহাকে পূজা করিত তখন তাহাকেই সর্ব্বপ্রধান দৈবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিত। সূর্য্য দেবতাই যেন সর্ব্বপ্রথমে প্রধানত্ব পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন বোধ হয়। পারস্য-আর্য্যের মধ্যে সূর্য্যই অধিদেবতাতে স্থিতি করিতেছে। আর অবস্তের সমকালীন আমাদের ব্রাহ্মণেতেও সূর্য্যদেবতাকে সর্ব্বোচ্চ পদ দিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; সূর্য্যকে বলিয়াছে "প্রসবিতা দেবানাং।" গায়ত্রীতেও দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও তাহার এখন ব্রাহ্ম অর্থ ঘটান হইয়াছে—যে সূর্য্য পৃথিবী দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষব্যাপী, যে-হেতু সূর্য্য আপন কিরণ দ্বারা সকল লোক উজ্জ্বল করিতেছে, কিরণ দ্বারা সে সকল লোকে ব্যাপ্ত আছে। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো

দেবস্য ধীমহি" 'সেই সবিতার কিনা জগৎ প্রসবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে ধী কিনা সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাসকল প্রেরণ করিতেছেন।' যখন ধী'র কথা উঠিয়াছে তখন সময় অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখনো সৌর বলিয়া এক মতাবলম্বী আছে যাহারা সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিয়া নমস্কার করে। ঐক্ষণে সূর্য্য দেবতার অত আধিপত্য নাই। সূর্য্যদেবতা যেন ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়াছে। পৃথিবীর এবং আকাশের দেবতারা, মনুষ্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ থাকাতে, ক্রমে প্রধান পদ অধিকার করিয়া লইল। নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রুদ্র অগ্নির স্থলাভিষিক্ত হইল, আর বিষ্ণু ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইল।

চতুর্ব্বেদ] বেদ চার; ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদ (যজুর্ব্বেদের দুই শাখা কৃষ্ণ যজু আর শুক্ল যজু) এবং অথর্ব্ব বেদ। এই এক একটা বেদের আবার তিন তিনটা ভাগ: সংহিতা ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ এবং সূত্র। উপনিষদ বা আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট, এইজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে।

ঋগ্বেদ] ঋক্ সংহিতা আর কিছু নয়, কেবল আর্য্যদিগের মেঠো গানের সংগ্রহ:—যে সকল গান পুরাতন বাসস্থান সিন্ধু নদীতীরে আর্য্যদিগের আপনাদের ও আপনাদের পশু সকলের ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া উষাময়ীকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল অথবা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গীত হইয়াছিল, —(যে ইন্দ্র বিদ্যুতের দ্বারা অন্ধকারের বলকে পরাহত করেন) এবং যে সকল গান যুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য ও জয় দান করিবার জন্য দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদে পরিপূর্ণ।—

ঋগ্বেদপ্রণেতা ঋষিবংশ অনুসারে ঋক্‌সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

সামবেদ] সোমযাগ অর্থাৎ—যে যজ্ঞে দেবতাদিগকে সোম দান করা হইত—এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি অন্যান্য যজ্ঞে, যে সকল ঋক্ গীত হইত, সেই ঋক্‌গুলি যজ্ঞে যেমন পরে পরে ব্যবহার হইত, সামবেদে, সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করা আছে। সংহিতার অর্থই সংগ্রহ করা, যাহা ছড়ান ছিল তাহাই একত্র করা। সোমপানবিষয়ক যে সকল ঋক ঋগ্বেদ আছে প্রায় সেই সকল ঋক গান আকারে সামবেদে আছে। ছন্দটা হইল ঋগ্বেদের, গানটা হইল সামবেদের। সামসংহিতার ঋকে কিন্তু ব্যাকরণের পুরাণো রকম গঠন দেখিয়া সামের ঋক্‌সমূহকে ঋগ্বেদের ঋক্ অপেক্ষা পুরাণো এবং প্রাথমিক বোধ হয়।

যজুর্ব্বেদ] সোমযাগ এবং অন্যান্য মেধে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত, সেই সকল মন্ত্র পরে পরে যেমন ব্যবহৃত হইত তাহারই আনুপূর্ব্বিক সংগ্রহ হইতেছে যজুর্ব্বেদ সংহিতা। যজুর্ব্বেদ সংহিতাদ্বয় গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। ইহার পদ্যভাগ প্রায় ঋগ্বেদে পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। গান এবং সূক্ত সকল (hymns) যখন মুখপরম্পরায় প্রথমে চলিয়া আসে তখন অবশ্য অনেকটা অদলবদল হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু লিখিয়া যে মন্ত্রাদি ঠিক রাখা সেই আদিম কালের পক্ষে একরূপ অসম্ভব—তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। এমন কি সংহিতার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের সময়ও লেখা লিপিবদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের এত ভিন্ন শাখা হইত না এবং যে সকল মূলের ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যা আছে তাহারা পরস্পর এত বিভিন্ন হইত না।

অথর্ব্ববেদ] ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের যে সময় বেশ আধিপত্য বিস্তার

হইয়াছে সেই সময় অথর্ব্ব সংহিতার কাল মনে করিতে হইবে। আর আর বিষয়ে ইহা ঋক্ সংহিতারই সদৃশ, এবং ইহাতে এই ব্রাহ্মণসময়কার পদ্য সংগ্রহ আছে। ইহার ভিতরের অনেক গান ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডল দশম মণ্ডলে আছে,—যে অংশটী ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। দেখিলে বোধ হয় ঋগ্বেদ যে সময় সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই সময় এই গানগুলাকেও তাহার মধ্যে পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অথর্ব্ববেদে তাহাদের সংগ্রহ যেন স্বাভাবিক এবং সময়োচিত ভাষণ (utterance) বোধ হয়।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের ভাব বেশ ভিন্ন টের পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে একটী জীবন্ত স্বাভাবিক ভাবের উচ্ছ্বাস, প্রকৃতির প্রতি গাঢ় প্রেমের উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; অথর্ব্ববেদে আর্য্যেরা ভূতপ্রেতের ভয়ে (anxious dread of evil spirits) এবং তাহাদিগের যাদুর ভয়ে (their magical powers) ভীত; ঋগ্বেদে তাহারা যেন স্বাধীন উদ্যমে পূর্ণ, কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতেছে না; অথর্ব্ববেদে তাহারা যেন 'বামুন'দের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, কুসংস্কার শৃঙ্খলে যেন বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনতার যেন স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু অথর্ব্ব সংহিতাতেও এমন সকল সূক্ত রহিয়াছে যাহা অতি পুরাকালের বলিয়া বোধ হয়, বোধ হয় সে সকল সূক্ত আর্য্যদিগের ইতর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল; আর ঋগ্বেদের গান সকল বোধ হয় আর্য্যদিগের প্রধান প্রধান বংশের সম্পত্তি ছিল। বোধ হয় অনেক যোঝাযুঝির পর তবে অথর্ব্ব ঋক্‌সকল চতুর্থবেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ঋক্ সাম যজুর ব্রাহ্মণের পুরাণো পুরাণো অংশে

ইহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণের সমকালীন অথর্ব্ব ঋক্‌সকল সংগৃহীত হইয়াছিল তাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষাকৃত শেষ অংশে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে তিন বেদই বিখ্যাত ছিল, পরে চতুর্ব্বেদ হইল।

ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণের সাধারণ ভাবটা এই :—যজ্ঞের গান ও মন্ত্রকে যজ্ঞক্রিয়ার সহিত সংলগ্ন করা, উহাদিগের মধ্যে যোগ স্থাপন করা। ইহা "ব্রাহ্মণ" করিয়াছে। এইজন্য ব্রাহ্মণে যজ্ঞের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ এক এক যজ্ঞে যেখানে যে গান যে ঋক্ যে মন্ত্র প্রয়োজন, সেইটী আনুপূর্ব্বিক ব্রাহ্মণে দেখান হইয়াছে।—বৈদিক ভাষার অর্থ বিন্যাস করা হইয়াছে। আর্য্যদিগের মধ্যে যে সকল প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে এবং পুরাণো পুরাণো উপাখ্যান যে সব প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে সে সকল সংগৃহীত হইল, আর উহাতে সে সময়কার তত্ত্ববিষয়ক মতামত সকলও ব্যক্ত হইল। আর্য্যভাব ও আর্য্যসভ্যতা হইতে ব্রাহ্মণ অথবা হিন্দুভাব ও হিন্দুসভ্যতায় পরিবর্ত্তনের সময়টায় ব্রাহ্মণকল্পের আবির্ভাব ; এমন কি বলিলেও হয় যে 'ব্রাহ্মণ'দ্বারা এই পরিবর্ত্তনটি ঘটিয়া উঠে। কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের আদিতে কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের শেষে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

বিশেষ বিশেষ প্রাজ্ঞ ঋষির মত যাহা মৌখিক প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া এবং শিষ্য ও বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যখন একই প্রবাদ নানা মুখে নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল, তখন সেই নানারূপ প্রবাদকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন হইল। এই উদ্দেশে সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ের নানা প্রকার

মত যে স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইয়াছিল, এক এক স্থানের পারগ ঋষিসকল সেই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাদকে সংগ্রহ করিয়া, যে ঋষি হইতে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে সব ধরিয়া দিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যেগুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইল অথবা যেগুলা সে সময়কার ভাবকে অধিক পোষণ করিল, তাহারাই পাঠ্য হওয়াতে সেইগুলিই এখন পাওয়া যায় অন্যগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। মতামত সম্বন্ধীয় পুস্তকসকলও এইরূপ; যে মত জয় যুক্ত হইয়াছিল তাহাই বিরোধী অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের পরিবর্ত্তে রহিয়া গিয়াছে। এইরূপে আমাদের কত পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষয়গত এই স্বতন্ত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়;—ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে যখন যজ্ঞবিষয়ে বক্তব্য বলে তখন হোতার বা ঋক্ পাঠকের যাহা কর্ত্তব্য সেইটুকুই বলে। হোতার কর্ম্ম—যে যে ঋক্ যে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের উপযোগী সেই সেই ঋক্ বাছিয়া লইয়া সেই সেই বিশেষ যজ্ঞে ব্যবহার করা। সেই যজ্ঞে সেই সকল ঋকের ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইত। সামবেদের ব্রাহ্মণে উদ্গাতা বা সামগায়কদিগের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুরই সম্বাদ আছে। তেমনি যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে অধ্বর্য্যু বা কর্ম্মীদিগের কর্ত্তব্যটুকু বিবৃত আছে। ঋকের ব্রাহ্মণে যজ্ঞেতে যেমন পরম্পরায় ঋকের ব্যবহার, সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ভাবে আছে; ঋক্ সংহিতাতে যে পরম্পরায় আছে তাহা ইহাতে নাই। কিন্তু সাম ও যজুর্ব্রাহ্মণে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েতেই সমান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সাম ও যজুর্ব্বেদের সংহিতা যজ্ঞপ্রণালী অনুসারেই গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋক্ সকল

সূক্তরচয়িতা ঋষি অনুসারেই সংহিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম হইতেছে শ্রুতি কিনা শ্রোনা অর্থাৎ বিশেষ করিয়া শুনিবার বিষয় বা শিখিবার বিষয়। নামের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ইতর সাধারণ লোকদিগের জন্য নহে, কিন্তু তখনকার শিক্ষিতদিগের জন্য উন্নত ব্রাহ্মণদিগেরই জন্য। ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও শ্রুতিশব্দ আপনাতে প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী সূত্রে ব্রাহ্মণকে শ্রুতি বলিয়া বলিয়াছে।

সূত্র) ব্রাহ্মণসাহিত্যের পরে সূত্রসাহিত্য আসিল। ব্রাহ্মণরূপ মূলপত্তন হইতেই ইহারা উত্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে যে পথ প্রদর্শিত হইল, সেই পথ ধরিয়া আরো ইহারা অগ্রসর হইল—, প্রণালীকে তন্ন তন্ন করিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়া গেল। সেই জন্য ইহাকে ব্রাহ্মণের বিস্তৃতি (supplement) বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ যখন বহুবিস্তৃত হইল, বিষয় যখন মেলা হইয়া পড়িল যখন গ্রন্থ পড়িতে গিয়া কোনটাই আয়ত্ত হয় না, এক একটা বিষয় বহুবিস্তৃত ব্রাহ্মণের নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকায় কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতে গেলে যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ না পড়িলে আর চলে না, যখন ইহাতে শিক্ষার বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তখন এক একটী বিষয় 'লাগডাঁট'রূপে আদ্যন্ত জানিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা সূত্রসাহিত্যের অবতরণ করিলেন। এক একটী বিষয় লইয়া যত বাহুল্য আন্দোলন হইয়াছিল কতকগুলা সূত্র করিয়া সবটা সাররূপে সংক্ষেপের মধ্যে একটুর মধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। রাশীকৃত আন্দোলনকে যতটা সংক্ষেপে করা যাইতে পারে যাহাতে স্মরণের আয়ত্ত হইতে পারে এমন ভাবে সূত্র সব

প্রস্তত হইয়াছিল। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং সূত্র-সাহিত্য ব্রাহ্মণভাগের উপর নির্ভর না করিয়া যত স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল এবং সূত্রের উপকরিতা যত হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, তত সূত্রের উন্নতি সাধন হইয়া হইয়া এমনি ঠাসা-ভাবে ও সংক্ষেপে লিখিত হইতে লাগিল যে গুরূপদেশ ও টীকা ব্যতীত তাহা একেবারেই দুর্বোধ হইয়া উঠিল। তখন সেই সূত্রগাঁথনি খুলিতে আবার রাশি রাশি পুস্তক তৈয়ারি করিতে হইয়াছিল। যে সূত্রগ্রন্থ যত পুরাণ তাহা তত বোধগম্য, যত আধুনিক তত দুরূহ।

শ্রৌতসূত্র] সূত্রসাহিত্য সর্ব্বতোভাবে যে ব্রাহ্মণের উপরেই রহিয়াছে তাহা নয়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধেই বাহুল্য উল্লেখ। এই যাগযজ্ঞ ঘটিত যে সকল সূত্র প্রস্তত হইয়াছে তাহাকেই বিশেষরূপে শ্রৌতসূত্র বলে, যে হেতু তাহার শ্রুতির উপরেই তাবৎ নির্ভর। শ্রৌতসূত্রের আর একটী নাম কল্পসূত্র। অন্য অন্য সূত্রের নাম যদিও মূল শ্রুতিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র আলোচনার ফল।

গৃহ্যসূত্র] এই শ্রৌতসূত্রের পাশাপাশি আমরা আরেক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক (ritual) সূত্র দেখিতে পাই,—ইহাকে গৃহ্যসূত্র বলে। ইহাতে সব ঘরাও অনুষ্ঠানের বিষয় বিবৃত আছে। যেমন গর্ভাধান, জন্মেষ্টি, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল সামাজিক অনুষ্ঠান, ইহাদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইত। কল্পসূত্রে সেই সকলের উল্লেখ। গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানটী পারিবারিক অনুষ্ঠান, ইহার দ্বারা প্রতি পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইল। ইহা পরিবারের

হিতোদ্দেশে করা হইল। আমাদের মধ্যে ত এখন গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া পরিবারদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয় না, উল্টা দলাদলি বাড়ে।

যেমন কল্পসূত্রের আর একটা নাম শ্রৌতসূত্র তেমনি গৃহ্যসূত্রের অপর নাম হইতেছে স্মার্ত্তসূত্র অর্থাৎ যে সূত্র স্মৃতির কিনা স্মরণের উপরে নির্ম্মিত।

যজ্ঞ ও গৃহকর্ম্ম, শ্রুতি ও স্মৃতি] সামাজিক আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের শিক্ষা গুরূপদেশের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাতে ভূমা আড়ম্বরের ভাবটা উদয় হয়, যাগযজ্ঞের কার্য্যটাকে এমন করিয়া সম্পন্ন করা চাই। যাগযজ্ঞে দক্ষ বিশেষ বিশেষ ঋষি যাঁহারা মনুষ্যের মনে ঐরূপ ভাব উৎপন্ন করিতে কুশল তাঁহাদিগের আলোচনা ও উদ্ভাবনা (speculation and suggestion) দ্বারা যাগযজ্ঞ সমুদয়, পরিপাটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে করিয়া লোকের মনে যজ্ঞের পবিত্র ভাব ও মহদ্ভাব বিরাজ করে। যদিও যাগযজ্ঞ প্রথমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণ ভাব ছিল, কিন্তু পরে আড়ম্বর বেশী বেশী হওয়াতে শিক্ষিত কতক লোকেরই আয়ত্তের বিষয় হইল, সুতরাং তাহাদের কাছ হইতে শুনিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। গৃহকর্ম্ম ত সেরূপ নয়, এটা যেন সকলেরই আয়ত্তাধীন। ইহা শৈশব হইতে আপনাদের গৃহে অনুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে স্মৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। ইহা শিখিবার জন্য কোন একটা উপায় অবলম্বন করিতে হয় না দেখিতে দেখিতেই হইয়া যায়, ইহা যেন গৃহস্থ মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, ব্যবহার করিলেই হয়। ইহাতে শ্রুতির আবশ্যক নাই কেবল স্মৃতির আবশ্যক। যাগযজ্ঞ যেমন অল্পসংখ্যক শিক্ষিত-

দিগের ধন, আচার ব্যবহার তেমনি সাধারণ সম্পত্তি, সকলেরই পক্ষে সুগম। তাই বলিয়া যে স্মৃতি অর্থাৎ আচার ব্যবহারের কালক্রমে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা নয়। আর্য্যেরা যখন আদিম-বাসীদিগকে বশে আনিয়া আপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপনে রত হইল, তাহাদিগের হস্তে তখন এত কর্ম্ম হইল, যে, তখন তাহাদের অন্য কিছু দেখিবার আর অবকাশ রহিল না; শত্রুদিগের হইতে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিতেই তাহাদিগের সকল উদ্যম পর্য্যন্ত হইল। এইরূপে একে একে যখন সকল বাধা অতিক্রম করিল, তখন তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিল, যে আর এক প্রবলতর শত্রুর হস্তে তাহারা আপনারা হাত পা বাঁধা হইয়া পড়িয়াছে। অথবা তাহারা আদপেই জাগ্রত হইতে আর পারিল না। মানসিক চালনার হানি করিয়া তাহাদিগের শারীরিক বল বীর্য্য এত পরিমাণে চালিত ও ব্যয়িত হইয়াছিল যে তাহাদিগের মানসিক শক্তি (intellectual energy) একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। এই যে নূতন প্রবলতর শত্রু তাহার বিবরণ এই :—

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি] যে সকল গান দ্বারা আর্য্যেরা সিন্ধুনদীতীরে আপনাদিগের পুরাতন বাসস্থানে প্রকৃতির মাহাত্ম্য পূজা করিত এবং সেই গানের সহিত যেরূপ বিধানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিত এই উভয়ই ক্রমে সেই সেই বংশে রহিয়া গেল—হয়ত যাহারা উহার রচয়িতা অথবা যে বংশে কুলপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল।—সেই সেই পরিবারের মধ্যে সেই সব প্রবাদও প্রচলিত রহিল যাহাদ্বারা ঐ সকল করণ কারণ বুঝাইতে পারা যায়; তাহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ড উভয়েরই অধিকারী হইয়া রহিল। এখন বিদেশে স্বদেশের বার্ত্তা যাহা কিছু আনীত হয়, তাহাই শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ

হয় তাহাই আন্তরিক সমাদরে গৃহীত হয়। এইরূপে এই সকল গায়কবংশেরা পুরোহিত বংশ হইয়া পড়িল; যতদিন যাইতে লাগিল, পূর্ব্বকার আবাসভূমি হইতে আর্য্যেরা যত দূরে প্রসৃত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং বাহিরের লড়াই হাঙ্গামায় যত তাহারা মত্ত হইয়া আপনাদিগের পুরাতন আচার প্রথা ভুলিয়া যাইতে লাগিল ততই তাহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পুরাতন আচার পুরাতন পূজাপ্রণালী রক্ষা করা সকলেরই অত্যন্ত যত্নের ধন হইল। এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই সকল যাহারা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহারা সেই সকলের প্রতিভূস্বরূপ হইল এবং অবশেষে তাহারা দেবতাদিগের প্রতি নিধিস্বরূপ হইয়া ভূদেবতা হইল। রাজন্যেরা হইলেন ভূপতি, ব্রাহ্মণেরা হইলেন ভূদেবতা। তাহারা আপনাদিগের সুবিধাকে এমন দৃঢ়বদ্ধ করিল যে পুরোহিত সাধারণের কর্ত্তৃত্ব এমন কেহ কোথাও দেখে নাই, আজও পর্য্যন্ত তাহা তেমনি অটল ভাবে রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে হিন্দুস্থানের জল বায়ু লোকের মনকে শিথিলগত্র করিয়া তুলে, তাহাও বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত টান ও শ্রদ্ধা ভক্তি। যাহার নিকট হইতে সেই সকল ভাব পূর্ণ হয় তাহাকে তাহারা দেবতুল্য দেখে। পূর্ব্বে যেমন অগ্নি সূর্য্য মেঘ হইতে উপকার পাইয়া তাহাদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিল, তেমনি বিদেশের কোলাহলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বদেশের সম্বাদ পাইয়া এবং বাহিরের শারীরিক কার্য্যের মধ্যে মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বাদ পাইয়া কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া সম্বাদদাতাদিগকে দেবতানির্ব্বিশেষে মানিতে লাগিলেন। সম্বাদ-

দাতাদিগকেও সম্বাদের বিষয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

ক্ষত্রিয়] তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বংশ, যাহারা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নায়ক ছিলেন, তাহারা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের রাজা হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। যুদ্ধ করা ইঁহাদিগের (profession) জীবনের কার্য্য হইয়া পড়িল, ইঁহারাই ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন। ইঁহারা একদিকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া এবং গো সুবর্ণ প্রভৃতি ধনদান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহিমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন আর একদিকে কৃষকদিগকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া উপনিবেশকে পালন করিতে লাগিলেন।

বৈশ্য ও শূদ্র] এই যে উপনিবেশের বাসিন্দা যাহারা চাষ আবাদ ও আপন আপন ব্যবসায় করিতে লাগিল, তাহারাই বিশ কিনা বৈশ্যজাতি হইল; ইহারাই সাধারণ মানুষ হইল। রাজা ইহাদিগেরই রাজা, এই জন্য রাজাকে বিশপতি বা বিশাম্পতি বলিত। ইহারা আবার শূদ্রদিগকে ধরিয়া মুটে মজুরগিরি করিয়া লইত। এই তিন (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইল জেতৃ-জাতি। আর জিতজাতি আদিমবাসী দস্যুগণ অথবা যাহারা ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হইয়া ব্রাত্য হইয়া পড়িল। যাহারা আদিমবাসীদিগের পরিণয়ে বদ্ধ হইয়া জেতৃজাতিতে কলঙ্ক আরোপ করিয়া পতিত হইল, তাহারাই বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইল, তাহারাই শূদ্র হইল। এখনকার দাস শব্দ বোধ হয় দস্যু শব্দের অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহারা যে আদিমবাসীর বংশ তাহা মনে করিতে হইবে না। কিন্তু দাস শব্দ এক চিহ্ন স্বরূপ, যাহাতে তাহাদিগের শূদ্রতা ব্যক্ত হইতেছে। ইহাদিগের আকার গঠনে

ইহাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বঙ্গ-দেশে ঐরূপ কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বালির দত্তেরা বড় স্বাধীন। যখন গৌড়দেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আইসেন তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে সহায়রূপে পাঁচজন শূদ্রও আইসে। তন্মধ্যে অন্যেরা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহারা উন্নত হইল, দত্তেরা ভৃত্যত্ব স্বীকার না করাতে উচ্চ কায়স্থ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইল।

এমন অনেক প্রবাদ আছে যে ক্ষত্রিয় রাজারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপরে আপনা-দিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই।

স্মৃতি] স্মৃতির প্রবাদ যখন পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতে আসিতে ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আর পুরাতন কিছুই থাকে না, তখন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইবার আবশ্যক হইল। অবশ্য ইহা শ্রুতির অনেক পরে। কেননা শ্রুতিটা কঠিন ব্যাপার হইল। স্মৃতিটা অত শীঘ্র লোকের মন হইতে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। স্মৃতি যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল সে সময়ে যেন ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ আধিপত্য। কিন্তু গার্হস্থ্য আচার পদ্ধতি (manners and customs) পূর্ব্বের মতই অনেকটা ছিল। ইহাদ্বারা পুরাকালের ভাব-বেশ পাঠ করা যায়। এই সকলেতেই হিন্দুদিগের ব্যবহারসাহিত্যের আদি অন্বেষণ করিতে হইবে। civil law দণ্ডনীতি এবং রাজনীতি এসব যেমন যেমন প্রয়োজন আসিতে পারে, বাহুল্যরূপে গ্রন্থবদ্ধ হইল। বেদের সময় দেখা যায় ভায়েরা সব যে একত্র থাকিত, কিন্তু ভায়েদের ছেলেরা

স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইত, সেই জন্য শত্রুর পর্য্যায় হইতেছে 'ভ্রাতৃব্য'। অর্থাৎ ভায়ে ভায়ে বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিত, ভাইপো হইলেই বিষয় লইয়া টানাটানি পড়িত। খুড়া বা জ্যেঠার যেন সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত না।

বৌদ্ধধর্ম্ম। জ্ঞানপদার্থের সহিত জড়পদার্থের সম্বন্ধের বিচার লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। সাংখ্যমত হইল বৌদ্ধদিগের, বেদান্তমত হইল ব্রাহ্মণদিগের। এক হইল জড়প্রধান, এক হইল পরমাত্মপ্রধান। অনাত্মবাদী কপিল মুনি সাংখ্যদর্শনের আবিষ্কারক; বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আদিবৌদ্ধ বলেন; অর্থাৎ শাক্যমুনি সাংখ্যদর্শন অবলম্বন করিয়া আপনার মত প্রকাশ করেন। শাক্যমুনির ধর্ম্ম যে নিরীশ্বর ধর্ম্ম তাহা নয়, উহা সেশ্বর ধর্ম্ম, কিন্তু উহার দর্শন সাংখ্য হওয়াতে, তাঁহার ছাত্রেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে ক্রমে নিরীশ্বর ধর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন। যখন শাক্যমুনি আপনার ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়িল; যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য উপপীড়িত শ্রেণী ইহাকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্যুক্ত হইল। তখন হয়ত মানবগৃহ্যসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মনুসংহিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। কপিলমুনির সাংখ্যদর্শনের পর বোধ হয় শাক্যমুনির অবতরণ। তাহার একটা কারণ এই, বৌদ্ধধর্ম্ম এতটা দর্শনের উপর নির্ভর করে, যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রণেতাকে মুনি উপাধি দেয়। কপিল যদিচ দর্শনকার, এবং আধুনিক সংস্কৃতে যদিও উঁহাকে মুনি বলে কিন্তু বেদে এবং রামায়ণ প্রভৃতি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে উঁহাকে ঋষি বলিয়াই বলিয়াছে। শাক্যকে কখন ঋষি বলে নাই, কিন্তু মুনি

বলিয়াছে ; ইহাদ্বারাও উহার আধুনিকতা প্রমাণ হইতেছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধধর্ম্ম। রামায়ণ মহাভারতের অনেক পরে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। রামায়ণ মহাভারতে ব্যাকরণ যতটা বদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় নাই। মহাভারতে রহিয়াছে, জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করিতে গিয়াছিলেন ; সিকন্দরের সময় তক্ষশিলার 'তক্ষিলা'রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ হইয়া পড়িয়াছে। নন্দবংশ প্রভৃতি ইহারা আধুনিক কালের বৌদ্ধধর্ম্মেরই সমকালবর্ত্তী। কপিলঋষি যদি অযোধ্যার সগর রাজার সমকালীন হয়েন—যে কপিল ঋষির উল্লেখ বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তবে সে কপিল ঋষি বৌদ্ধধর্ম্মের কত পূর্ব্বে। বৌদ্ধের অবতার কৃষ্ণাবতারের পরে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে অবধি প্রচার হইয়াছে সে কাল ইতিহাসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ইতিহাসের দিকে আসিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সংস্কার। যখন আত্মোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল দেবদেবীর উপাসনা করিলেই মুক্তি, এই ভাব প্রবল, আপনাকে উন্নত করিবার দিকে লক্ষ্য নাই, ব্রাহ্মণেরা যখন ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িল, তাহাদিগের আধিপত্য যখন তাহাদিগের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল জাতিগত হইয়া দাঁড়াইল, তখনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মকাল। যখন ব্রাহ্মণ দিগের প্রতি শ্রদ্ধা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনি এই নূতন ধর্ম্মের আরম্ভ বলিতে হইবে। তখন সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা চলে না, প্রাকৃততেই কথাবার্ত্তা চলে, আর শ্লোকাদি আধ-সংস্কৃত আধ-প্রাকৃত এইরূপ একপ্রকার গাথায় রচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক

ধর্ম্মপ্রসূত পুরাণ প্রভৃতির এবং বলিদানযুক্ত যাগযজ্ঞের বিপক্ষে ব্রাহ্মণজাতির প্রতিকূলে উত্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংস্কাররূপে উদয় হইল; এইজন্য ইহা হৃদয়ের ভাবের উপর তত না দাঁড়াইয়া বুদ্ধির উপর দণ্ডায়মান হইল। ইহা দার্শনিক ধর্ম্ম হইল। এই ধর্ম্ম সাংখ্যমতের উপর দণ্ডায়মান থাকাতে, শেষে ইহা নিরীশ্বর ধর্ম্ম হইয়া পড়িল, কেবল কর্ম্মের ধর্ম্ম এবং আত্মোৎকর্ষের ধর্ম্ম হইল। সে ধর্ম্ম কতকাল তিষ্ঠিতে পারে? ছোটলোকদিগের মধ্যে সেই ধর্ম্ম গিয়া পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইয়া পড়িল; অনেক পৌত্তলিক ধর্ম্ম ছিল তাহার মধ্যে ইহাও একটা বেশী হইল মাত্র। তবে ইহার দ্বারা এই উপকার হইল, যে, ব্রাহ্মণেরা যে সুখে শয়ান ছিলেন তাহা ঘুচিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের আলোচনা ও স্বাভাবিক সংস্করণ হইতে আরম্ভ হইল অর্থাৎ বেদকে বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ হইতে লাগিল। সেই সংস্কারকদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শঙ্করাচার্য্য। তিনি বেদবেদান্ত লইয়া আপনার মতানু-রূপ তাহাদের টীকা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পর বৈদিক ধর্ম্মের তিনিই পুনরুদ্ধর্ত্তা বলিতে হইবে। উঁহারি উপ-নিষদ্ লইয়া রামমোহন রায় আমাদিগের দেশে সমুদয় ভারতবর্ষে নিদ্রিত বেদকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

ব্যাকরণের সূত্রপাত] যেমন স্মৃতির উপর দণ্ডায়মান হইয়া গৃহ্যসূত্র ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— ব্রাহ্মণের সঙ্গে উহার অল্পই যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখিবে ভাষাবিষয়ক সূত্র সকলও স্বতন্ত্র পত্তনের উপর দণ্ডায়-মান। যজ্ঞের মন্ত্র ও গানের যেটুকু সম্বন্ধ তাহাই ব্রাহ্মণে আছে।

ব্যাকরণের সূত্রসকল মূলে ব্রাহ্মণের উপরেই নির্ভর করে বটে কিন্তু তারপরে উহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে অবশ্য যাগযজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদিগকে কিরূপে আহ্বান করিতে হয়, কখন কি করিতে হয় তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে ঐ সকল প্রার্থনাসূচক কৃতজ্ঞতাসূচক মন্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, যাহাতে অন্য কিছু না উহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহারে উপায় বিহিত হইতে লাগিল। সেইজন্য প্রথমে ছড়ান ঋক্‌গুলা সংহিত করিবার আবশ্যক হইল। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পাঠ ঠিক করিতে হইল। এবং তৃতীয়তঃ সেই সকল কাহার দ্বারা রচিত, কি উপলক্ষে রচিত, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রবাদ সব গ্রন্থবদ্ধ হইল। প্রথম এই সকল রক্ষা করিবার প্রতিই দৃষ্টি গিয়াছিল। পরে অনেক দিন অতীত হইলে যখন বৈদিক ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া সংস্কৃত ভাষা বিকাশোন্মুখ হইতে লাগিল, তখন ক্রমে বেদের অর্থ বোধগম্য হওয়া দুরূহ হইতে লাগিল—যত শীঘ্র সাধারণের হইয়াছিল ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য তাহার অনেক পরে হইয়াছিল—তখনি উহার অর্থকে নিরাপদ এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পড়িয়া গেল। এই জন্য যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে দক্ষ, তাঁহারা সব শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—কেবল যে অর্থ বিষয়ে তাহা নয়; উপাসনা, যাগযজ্ঞের প্রণালী, বেদের অর্থ, তাৎপর্য্য ও দর্শন এ সকল বিষয়েই আলোচনা চলিতে লাগিল। মেয়েরা পর্য্যন্ত এই আলোচনার সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতির নিকটে সম্মানের পদ রক্ষা করিতে পারিলেন তাহার কারণও ইহাই। যত যেখানকার উচ্চভাবের গ্রন্থ দেখিতে পাইবে সবই ব্রাহ্মণদিগের রচিত; কাযে

কাযেই কৃতজ্ঞতা ভক্তি সেই শ্রেণীর উপরে গেল। অন্য সকলে বিষয়ে মত্ত, তাঁহারাই কেবল পরমাত্মচিন্তনে রত। ক্ষত্রিয় রাজারাও এই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। মন যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে ব্রাহ্মণরা তত উচ্চে উঠিতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যে সকল প্রশ্ন ও মত ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে পুরুষেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে গার্গীর কথা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

এই আলোচনার স্রোতের সময় ভাষাবিষয়ক গবেষণাও বিশেষ উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। বেদের যত শাখা হইয়া পড়িয়াছিল সকল শাখাগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থবদ্ধ করা হইল। আর তাহাদের পাঠনাপ্রণালী এমনি বিধিবদ্ধ করিয়া দিল, যে, তাহার আর নড়চড় হইবার যো নাই। এক এক বেদের এক এক প্রতিশাখ্য করা হইল, তাহাতে সেই সেই বেদের যত রকম শাখা হইয়াছিল সব ধরা হইল। তাহাতে শব্দের উচ্চারণভেদ, উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় সকল বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; গুরুর নিকট ছাত্রের শিক্ষার সময়ে যেরূপে রকম রকম করিয়া পড়িতে হয় তাহাও বর্ণিত আছে। কি যত্নের সহিত যে তাঁহারা বেদকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ইহার দ্বারা বেশ টের পাওয়া যায়।

বৈদিক ছন্দ ও দেবতা।] বেদের ছন্দপ্রণালী জানিবার জন্যও সূত্রে তাহার বিবরণ রহিয়াছে; তাহার নাম নিদানসূত্র। ঋগ্বেদের আধুনিক ঋকের ভিতরেও কতক কতক ছন্দের নাম আছে। আর প্রতি বেদের অনুক্রমণী আছে, তাহাতে প্রতি

সূক্তের রচয়িতা ঋষির, ছন্দের ও উদ্দেশ্য দেবতার নাম বর্ণিত আছে। অনুক্রমণী বোধ হয় সূত্রের পরে রচিত হইয়াছিল—এমন কোন সময়, যখন প্রতি সংহিতার মূল এখন যেরূপ দেখিতে পাই সেইরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং অভ্যাসের সুগমার্থে বড় বড় এবং ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রতম ভাগ শিষ্যদিগের এক একবারের পাঠ হইত।

বৈদিক প্রবাদ ও গাথা ইতিহাস পুরাণের মূল। } সূক্ত রচয়িতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল কেহ কেহ সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ করিলেন; যেমন শৌনকের বৃহদ্দেবতা। ইহা ঋকসংহিতাকে মূল অবলম্বন করিয়া কেবল দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া কোন্ ঋক্ প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ঋক্ সম্বন্ধে যত রকম প্রবাদ আছে, তাহাই সব বর্ণন করিয়াছে। অবশ্য এই সকল প্রবাদের যেগুলা খুব পুরাণো প্রবাদ তাহা ব্রাহ্মণেতেই আছে; যেমন শুনঃশেফ ঋষির প্রবাদ। বিশেষ বিশেষ পূজাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের প্রবাদসকলও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণ অনেক সময়ে গাথার উপর নির্দ্দেশ করে, যাহা ইতর লোকদিগের মধ্যে শ্রুতি-পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। এই সকল গাথা বোধ হয় ইতিহাস পুরাণের মূল। মহাভারতের মধ্যে দুটী একটী গাথা দেখিতে পাওয়া যায়। শৌনকের বৃহদ্দেবতা যাস্কের নিরুক্তির উপরেই সম্যক অধিষ্ঠিত।

নিঘণ্টু] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেবগণের স্তোত্র প্রভৃতির অর্থ নির্ণয়ে তখন প্রবৃত্ত হইল, যখন বেদের অর্থ দুরূহ হইয়া পড়িল। ইতর সাধারণের নিকট যত শীঘ্র দুরূহ হইয়াছিল.

ব্রাহ্মণদিগের নিকট কিছু তত শীঘ্র হয় নাই। যাহা হউক বৈদিক ভাষা তখন অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। অতএব সেই দুরবগম্য স্তোত্রসকল বোধগম্য করিবার জন্য প্রথম উপায় হইল: বেদের যত একার্থবাচক শব্দ তাহাদিগকে সংগ্রহ করা, আর যে শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের অর্থ স্বতন্ত্র-রূপে উপদেশ দেওয়া। এইরূপ অভিধানের নাম দিল নিঘণ্টু অর্থাৎ যত শব্দ আছে সবটা নির্ঘণ্ট করিয়া দিল—সবটা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিয়া দিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সবটা নিঃশেষে গাঁথিয়া দিল, এই জন্য 'নিগ্রন্থ'র অপভ্রংশ 'নিঘণ্টু' হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় আমাদিগের নির্ঘণ্ট কথা চলিত আছে। নিঘণ্টু রচয়িতাকে নৈঘণ্টুক বলে। বেদের নিঘণ্টু পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তক। ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে সমনামশব্দ, চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ দুরূহ বৈদিক শব্দ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের পর্য্যায় নির্দ্দেশ আছে।

নিরুক্তি] এই নিঘণ্টুকে সহজ করিবার জন্য, প্রকাশ করিবার জন্য, আবার যাস্ক উহার নিরুক্তি প্রকাশ করিলেন। নিরুক্তি কিনা খুলে বলা—যাহা কিছু বলিবার আছে স্পষ্ট করিয়া ভাঙ্গিয়া বলা। ইহা প্রথমে দ্বাদশ-অধ্যায় ছিল, পরে আর দুই অধ্যায় উহাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেদাঙ্গ] এই নিরুক্তকে বেদাঙ্গের মধ্যে ধরা হয়। বেদাঙ্গ হইতেছে ছয়টা—"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঞ্ছন্দো জ্যোতিষ-মিতি।" শিক্ষা হইতেছে বৈদিক সন্ধির নিয়মাদি, কল্প হই-তেছে ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা, ব্যাকরণ হইতেছে বাক্যের উৎপত্তি ও নিয়মকে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাকরণ করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া

দেখা, ছন্দ হইতেছে বৈদিক পদ্যের নিয়ম স্থির করা, নিরুক্ত হইতেছে বৈদিক শব্দের বিবরণাদি, জ্যোতিষ, বৈদিক ক্রিয়ার কাল নিরূপণ করার ব্যবস্থা। এই ষড়ঙ্গ না জানিলে বেদজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গতা সম্পন্ন হয় না। নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে বৈদিক সময়ের এক একটী করিয়া চারিটী গ্রন্থ পাওয়া যায়, আর সকল গ্রন্থ লোপ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই চারিটী বিশেষ গ্রন্থকেই আধুনিকেরা বেদের চারি অঙ্গ বলে। পূর্ব্বে ঐ ঐ শ্রেণীর পুস্তক সকলকে বেদাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত ঃ যেমন ব্যকরণ। পাণিনির ব্যাকরণকেই যে ব্যাকরণ বলে তাহা নয়, ঐ শ্রেণীর পুস্তকমাত্রকেই ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণের উৎপত্তি] যাস্কের নিরুক্তিতে আমরা ব্যাকরণের সাধারণ আভাস পাই। প্রতিশাখ্যেতে বেদসংহিতার প্রত্যেক সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমে সন্ধির সাধারণ নিয়ম উঠিল—তাহা হইতে ক্রমে আবার ভাষার অন্য অন্য অঙ্গে দৃষ্টি গেল।—যেমন বিভক্তি প্রত্যয় ধাতু রচনাপ্রণালী প্রভৃতি। যাস্ক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বৈয়াকরণের বিশেষরূপে নামও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আবার সাধারণরূপে বৈয়াকরণ বা নৈরুক্ত এইরূপও বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সে সময়ে শব্দজ্ঞানের খুব চর্চ্চা চলিয়াছিল। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এক স্থান পাঠ করিয়া বেশ বোধ হয়, যে, সে সময়ে হিন্দুস্থানের উত্তরে ভাষাগবেষণা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল।

পাণিনি] সেই হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ব্যাকরণ শাস্ত্রের

জনকস্বরূপ পাণিনিরও জন্মস্থান। এখন যাস্ককে যদি বৈদিক যুগের শেষ সময়ের ধরিতে হয়, তবে পাণিনির কালকে তাহার বহুপরবর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হইবে। যাস্কের সময়ে বাক্যের অনুরূপ শব্দ দ্বারা ব্যাকরণের কথা সকল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পাণিনির সময়ে অঙ্কের চিহ্নের ন্যায় করিয়া অর্থাৎ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সেই সব শব্দকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। উহা হইতে ইহাতে আসিতে অনেক কালের আলোচনার আবশ্যক বোধ হয়। পাণিনি নিজেই সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া যখন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিনির পূর্ব্বেই ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল জানিতে হইবে। তিনি উহার আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু ঐ প্রণালীকে পরিপক্করূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—যাহা ব্যাকরণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

দর্শন] ব্রাহ্মণের সমকালে এবং পরে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত উন্নতভাব ধারণ করিয়াছিল। এমন কি ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে হিন্দুগন নিপুণতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক সূক্ত পাওয়া যায়, যাহাতে করিয়া মূল কারণ সম্বন্ধে গম্ভীর আলোচনা প্রকাশ পায়, যাহাতে করিয়া জানা যাইতেছে, যে ঐ সকল আলোচনা তাহার অনেককাল পূর্ব্ব হইতে আন্দোলিত হইয়া আসিতেছে।

ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেই খুব পূর্ব্বকালে যখন তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাটা একবার বেশ জমিয়া উঠিল, তখন নানা প্রকার মত, বিশেষতঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক মত প্রবর্ত্তিত হইল। যে সমস্যা (problem) সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ় ও কঠিন তাহাই তাহাদিগের

সর্ব্বাপেক্ষা আদরের হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই ঐ বিষয়ের এক বা ততোধিক বিবরণ বিবৃত আছে। অনেক গ্রন্থে সৃষ্টিসম্বন্ধে নানা প্রকার মতের অবতারণা আছে, তন্মধ্যে একটী প্রধান মতভেদ স্বভাবত এই দাঁড়াইল, যে, আদি কারণ কে? প্রকৃতি কি পুরুষ—অর্থাৎ জড় কি জ্ঞান? শেষোক্ত মতটাই জয়লাভ করিল, এই জন্য ব্রাহ্মণে এই মতটাই একচেটিয়ারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত মতটাও যদিও তত সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু তথাপি রহিয়া গেল। কালে সেই মত যখন অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইল।

ষড়্দর্শন] বৈদিক কালে দর্শনশাস্ত্র প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই, পরে যেমন ষড়্দর্শন প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপনিষদে অসম্বদ্ধ মত ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। যদিও সেই সকল আলোচনাকে বিভক্ত ও প্রণালিবদ্ধ করিবার রীতি দেখা যায়, তথাপি, ঐ সকল অনুসন্ধানের পরিসর অতি পরিমিত। আরণ্যক উপনিষদে প্রণালিবদ্ধ করিবার ও বিস্তার করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। যে উপনিষদ স্বত দণ্ডায়মান, তাহাতে আরও বেশী। আর, যে উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের, তাহাতে দার্শনিক প্রণালী সম্যকরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আসল যে দর্শনশাস্ত্র, যাহাকে ষড়্দর্শনসূত্র বলে, তাহা যে ইহার অনেক পরে, তাহা নিম্নলিখিত কারণে বেশ প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমত যে সকল ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সে সকলেতেও ষড়্দর্শন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ নাই, যদিও থাকে তাহা অন্য সম্বন্ধে, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে নয়। দ্বিতীয়ত, ষড়্দর্শনের ভিতর যে সকল ঋষিদিগের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে, শেষাশেষি-

মাত্র কল্পসূত্র সকলে যে সকল ঋষির নাম করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে, আংশিক ঐক্য আছে। তৃতীয়ত, সমস্ত ষড়্দর্শন অবিভাগে, সংহিতা ব্রাহ্মণ উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থসমূহকে সমগ্ররূপে একবেদ বলিয়া বলে এবং নির্দ্দেশ করিবার (reference) সময় আমাদিগের নিকট যে সকল উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয় এমন কি অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ সকলকে নির্দ্দেশ করে। আর রচনাপ্রণালীও এমনি অল্পের মধ্যে বহুজ্ঞাপক, আর এত সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা (technical terms) —যদিও ব্যাকরণের ন্যায় অতদূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি এমন স্পষ্ট ব্যঞ্জক (precision) এবং আদ্যন্তসুন্দর, যে, উহা অনেক পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে অভ্যাসের বিষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এইজন্য ইহা বৈদিক কালের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

জ্যোতিষ। বৈদিক সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে জ্যোতিষ ও বৈদ্যশাস্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ না বলিয়া শেষ করা যায় না। যদিও তদানীন্তন কালের এই দুই বিষয়সম্বন্ধীয় বহুল পুস্তক ইদানীন্তন প্রচার নাই। কিন্তু সে সময় ইহার খুব চর্চ্চা ছিল। উভয়ই কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন হইতেই প্রথম উচ্ছ্বাস (impulse) প্রাপ্ত হইয়াছিল। কল্পে কল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল নির্ণয়ার্থে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যার হোমের জন্য, দর্শপৌর্ণমাসীর জন্য এবং তিন ঋতুর প্রারম্ভে হোমযাগের জন্য, নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইত, যদিও তাহা অত্যন্ত সামান্য মাত্র ছিল। বাজসনেয়ি সংহিতাতে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে নক্ষত্রদর্শকদিগের বিষয় এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার কথা বিশেষ করিয়া বলা আছে। আর চন্দ্রের অষ্টাবিংশ অবস্থানের বিষয়ও খুব পূর্ব্বে অবগত ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে তাহা-

দের আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ আছে। যে পরম্পরায় তাহাদের উল্লেখ আছে, সে পরম্পরা ২৭৮০ হইতে ১৮২০ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বে থাকিতে পারে; তাহা হইলে তৈত্তিরীয় সংহিতা সেই সময়ের হইবার সম্ভাবনা।—সংহিতা না হউক সেই সকল শ্রুতি। তাহা এখনকার তিন চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। জ্যোতিষ নামক গ্রন্থে যে নক্ষত্রপরম্পরা আছে, তাহা হইতেছে ভরণীশ্রেণী, তাহাতে ১৮২০—৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব বৎসর পাইতেছি। আর আর বিষয়ে বড় একটা উন্নতি দেখিতে পাই না। চন্দ্রের গতি আলোচনা করিতেন, কতকগুলা ধ্রুব তারা, সৌর-অয়ন (solstice), ইহাই কেবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ) শারীর-সংস্থান তাঁহাদিগের জানিতে হইত, কারণ যজ্ঞে যে সকল পশুবলি হইত, তাহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বাটিয়া দিতে হইত। পাশব শারীর-সংস্থান তাঁহাদিগের বিশিষ্টরূপে জানা ছিল, কারণ যখন দেখা যাইতেছে পশুদেহের প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা ছিল।

ভৈষজ্যবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে রোগের উপর এবং আরোগ্যকারী উদ্ভিদের উপর প্রশংসাসূচক ঋক্ প্রচারিত আছে, আর বড় কিছু পাওয়া যায় না।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

সচিত্র **পুণ্য।** মাসিকপত্র

পঞ্চম বর্ষ।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, খাদ্যপাক, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।

নানা রঙের ছবি, নানা প্রকার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যপাক, ধর্ম্ম ইতিহাস পুরাতত্ত্ব দর্শন সাহিত্য সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, দেশী, হিন্দুস্থানী, ফরাসী ও ইটালীয় সঙ্গীত প্রভৃতির স্বরলিপি, জ্যাকেটকাটা ও পরম ও রেশমের জুতা মোজা শাল প্রভৃতি নানাবিধ শেলাইয়ের কারুকার্য্য এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ—এতদ্ভিন্ন ইতিহাস বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব শিল্প প্রভৃতি নানা বিভাগে নব নব আবিষ্কৃত বিষয় সমূহ এবং মধুর মধুর কবিতা, জীবনের জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রদ, গৃহের প্রয়োজনীয় এবং শোভাসম্পাদনকারী স্বাস্থ্যজনক বিষয় পুণ্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে। পুণ্যে পুরাতন ও নূতনের মর্য্যাদা, স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের মর্য্যাদা, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়ের মর্য্যাদা নিরপেক্ষভাবে সমদৃষ্টিতে রক্ষিত হইয়া থাকে।

সম্পাদক { শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর
শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর।

৩৪ নং অপারচিৎপুর রোড অথবা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।